দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ * ১৭ তম সংখ্যা * ১৮ নভেম্বর ২০২৪

এই সংখ্যায় থাকছে

- ট্রাম্পের জয়, ডেমোক্র্যাটদের হতাশার প্রতিফলন ২
- আর কবে? জবাব চায় জনতা মণিপুর নিয়ে নিশ্চুপ কেন্দ্র ৩
- প্রসঙ্গ : ঋত্বিক ঘটক - তানভীর মোকাম্মেলের সাক্ষাৎকার ৫
- মোহর ১৩
- নভেম্বর বিপ্লব প্রসঙ্গে জওহরলাল ও কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সম্পর্ক ১৬
- ১৯১৭-এর বিপ্লবে আবার ফেরা ১৯
- জাতীয়তাবাদ সংখ্যালঘুর কথা ভাবে না। নাগরিক জাতীয়তাবাদ দক্ষিণ এশিয়াতে স্বপ্ন মাত্র। ২৩
- শাসনের মুখ্য ভূমিকায় কি মহামান্য আদালত? ২৪
- ওয়াকফ সংশোধনী বিল- বিভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা ২৭
- মোদী ঘনিষ্ঠ আদানীর মনোপলি বাঁচাও সিন্ডিকেটে সেবি প্রধান মাধবী বুচের ভূমিকা ২৯
- বিধানসভা নির্বাচন সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোই বিজেপির একমাত্র পথ ৩১
- স্মরণ : 'অগ্নিকন্যা' মতিয়া চৌধুরী আর নেই ৩২
- চলে গেলেন কিংবদন্তী নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্র ৩৩
- বাংলার আপনজন রাদিচে প্রয়াত ৩৩
- বাংলা ভাষার ধ্রুপদী ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রসঙ্গে
- কিছু কথা ৩৪

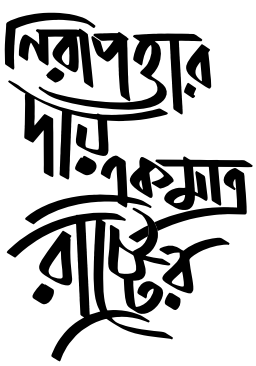

সম্পাদকীয়

দুর্বল শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে বুলডোজার ব্যবহার নিষিদ্ধ - সুপ্রিম কোর্ট

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার কার্যকাল শুরু হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী 'বুলডোজার ন্যায়বিচার' রায় প্রদানের সাথে যা বিশ্বব্যাপী শিরোনাম দখল করেছে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বি আর গাভাই এবং কে ভি বিশ্বনাথনের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ সম্প্রতি যে রায়টি দিয়েছে তা নতুন প্রধান বিচারপতির সময়ের সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণকারী ঘটনাগুলির একটি হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রায়টি বেশ কঠিন হয়েছে কারণ এটি দেওয়া হয় ইউপি-র যোগী আদিত্যনাথের মতো মুখ্যমন্ত্রীদের সরাসরি লক্ষ্য করে, যারা ন্যায়বিচার এবং সমদৃষ্টির ধারণাটি নস্যাৎ করতে মুসলিম, দলিত এবং অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলির ওপর নির্বিচারে বুলডোজার ব্যবহার করে থাকে। এই ধরনের জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা ধর্মীয় অনুদারতার আশ্রয়ও নিয়ে থাকে।

অনেক নাগরিক অধিকার সমর্থক এবং আইন বিশেষজ্ঞদের জন্য, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টি সরকারের দ্বারা বিচারবহির্ভূত পদক্ষেপের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় ও নাগরিক সুরক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও উল্লেখযোগ্য উৎসাহের সঙ্গে রায়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, বিশেষ করে, ভারতীয় সমাজের অংশগুলিকে চিহ্নিত করতে আসা ঘৃণা ও ভয়ের ক্রমবর্ধমান পরিবেশে একটি সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে এই রায়ের প্রশংসা করেছে। সংস্থাটি আশা প্রকাশ করেছে যে এই সিদ্ধান্তটি ভারতে মানবাধিকারের আরও শক্তিশালী প্রতিরক্ষার সূচনা করতে পারে, বিশেষ করে মুসলিম নাগরিকদের জন্য, যারা বুলডোজার দ্বারা ধ্বংসের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। অ্যামেনেস্টির প্রতিক্রিয়া ভারতে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অবক্ষয় এবং কর্তৃত্ববাদের উত্থান সম্পর্কে বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়। বুলডোজারের রায়, এই অর্থে, শুধুমাত্র একটি জাতীয় নয় বরং একটি আন্তর্জাতিক সংকেতও ছিল যে ভারতের আদালতগুলি রাজনৈতিক আবহাওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের কর্মের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বজায় রাখতে প্রস্তুত।

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

ট্রাম্পের জয়, ডেমোক্র্যাটদের হতাশার প্রতিফলন

সৌর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ফল। অনেকেই মনে করেছিলেন এবার কমলা হ্যারিস ক্ষমতায় আসছেন । কিন্তু ক্ষমতায় এলেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসাটা অভূতপূর্ব। ২০১৬ থেকে ২০২০ তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। ২০২০ সালে ডেমোক্রাট প্রার্থী জো বিডেনের কাছে পরাজিত হয়ে তাকে গদি ছাড়তে হয়। যদিও পরাজয় তিনি সহজে মেনে নেননি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল কারচুপি করে তাকে হারানো হয়েছে। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ঘটনা সকলের স্মরণে আছে। সেদিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাঙ্গপাঙ্গরা ক্যাপিটল বিল্ডিং আক্রমণ করে একটি কুৎসিত নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করে।

আমেরিকার গণতন্ত্র সেদিন কালিমা লিপ্ত হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কুকীর্তির নিদর্শন ভুরি ভুরি। ট্রাম্প ঘোরতর নারী বিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষী,ট্রাম্পের বিরুদ্ধে যৌন কেলেংকারীর অভিযোগ, আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ, ট্রাম্প দুর্বিনীত , সর্বোপরি ট্রাম্প একজন নীতিভ্রষ্ট প্রশাসক। এ হেন ট্রাম্পকে আমেরিকার জনগণ কেন গদিতে বসালো তা সত্যিই অবাক করার মত বিষয়।

ট্রাম্পের ঐতিহাসিক জয়ের পিছনে কাজ করেছে জো বিডেনের ইসরাইল সম্পর্কিত নীতি। ইসরাইলের গাজা ভূখণ্ডের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ করে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা এবং জো বিডেনের এই হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে সামিল হওয়া ডেমোক্র্যাটদের বিপক্ষে গেছে। অনেকের মতে কমলা হ্যারিস সময় পেয়েছিলেন কম। তাছাড়া জো বিডেনের প্রশাসনের দায়ভার এসে পড়েছে কমলা হ্যারিসের উপর। যদিও জো বিডেনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূদ্রাস্ফীতি শতকরা দুই শতাংশে নেমে এসেছিল। বেকারির হার কম ছিল। অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজন বলেছেন মূদ্রাস্ফীতির হার কম থাকলেও, অর্থনৈতিক বৈষম্য বেশি ছিল। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন বিত্তের জীবনযাত্রায় তার প্রভাব পড়েছিল। তবে একথাও সত্য যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে কর্মনিয়োগ বিডেন প্রশাসনের চেয়ে বেশি হয়েছিল। কমলা হ্যারিস ধনীদের উপর থেকে করের মাত্রা কম করার কথা বলেছিলেন। মার্কিন দেশে বসবাসকারী বিদেশীদের অভিবাসন নীতির সরলীকরণ চেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা, আইডাহো, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ওয়াই মিন, আরকানসাস প্রমুখ স্টেট গুলিতে, রিপাবলিকান দলের আধিপত্য। নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন, মেসাচুসেটস, প্রভৃতি স্টেটে ডেমোক্র্যাটরা শক্তিশালী। এছাড়া সাতটি স্টেট রয়েছে যাদের সুইংস্টেট বলা হয় অর্থাৎ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের আধিপত্য সেখানে নেই। এবারের নির্বাচনে এই সাতটি স্টেটের, (কলোরাডো, পেনসিলভেনিয়া প্রমুখ) সবকটিই রিপাবলিকানরা দখল করে নেয়। শুধু তাই নয় সেনেট এখন রিপাবলিকানদের দখলে। সেনেটে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সেনেট নিয়োগ করে। এবারের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেনেট দুটো স্তরে ই রিপাবলিকানদের আধিপত্য স্থাপিত হল।

এখন প্রশ্নটা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত একজন দুর্নীতি পরায়ন, স্বৈরাচারী ব্যক্তিত্ব কিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় এলো? ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালে ৭৫.৫ মিলিয়ন ভোট পেয়েছেন। তিনি ২০২০ সালে পেয়েছিলেন ৭৪.২ মিলিয়ন ভোট। অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার তার ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে ১ মিলিয়নের কিছু বেশি। ২০২৪ সালে হ্যারিস পেয়েছেন ৭২.৪ মিলিয়ন ভোট এবং ২০২০ সালে জো বিডেন পেয়েছিলেন ৮১.৩ মিলিয়ন ভোট। ২০২০ থেকে ২০২৪ এই বছরের মধ্যে ডেমোক্রাটদের ভোট প্রায় ৯ মিলিয়ন কমে গিয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের অন্যতম কারণ ডেমোক্রেটরা জো বিডেন এবং কমলা হ্যারিসের এর প্রশাসনিক দক্ষতার উপর আস্থা রাখতে পারেনি।জো বিডেন প্রশাসন ইসরাইল কর্তৃক গাজা আক্রমণকে সমর্থন জানিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ এবং ছাত্রসমাজ, গাজা গণহত্যার বিপক্ষে ছিল। অন্তত ১০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাজার গণহত্যার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন হয়। ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইল এর সমর্থক কোটিপতি ধনী মার্কিন ব্যবসায়ীরা ছাত্র বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ দাবি করে। কমলা হ্যারিস, জো বিডেনের ইসরাইলপন্থী নীতির সমর্থক। আরব আমেরিকানরা, জো বিডেনের ইসরাইল পন্থী নীতির বিরোধী। তারা গাজা হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। ইসরাইল পন্থী নীতি সমর্থনের জন্য তারা কমলা হ্যারিসের উপরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের বিক্ষোভ প্রতিফলিত হয় ভোট বাক্সে। আরব আমেরিকান অধ্যুষিত শহর মিশিগান , ডিয়ারবর্ন, প্রমুখ অঞ্চলে কমলা হ্যারিসের থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ৬ শতাংশ ভোট বেশি পান। অথচ এই অঞ্চলে ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বিডেন প্রচুর ভোট পেয়েছিলেন।

বার্নি স্যান্ডার্স আমেরিকার জনপ্রিয় বামপন্থী নেতা। শ্রমিক শ্রেণীর উপর তাঁর ব্যাপক প্রভাব। বিগত নির্বাচনে স্যান্ডার্সের নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গ শ্রমিক শ্রেণী ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিয়েছিল। কিন্তু বিডেন প্রশাসন শ্রমিকদের জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। শ্রমিক শ্রেণী আশাহত হয়।এবারের নির্বাচনে শ্রমিক শ্রেণীর অনেকে ভোটে অংশগ্রহণ

করে নি, যারা অংশগ্রহণ করেছে, তাদের অধিকাংশই কমলা হ্যারিসের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে।কমলা হ্যারিসের পরাজয়ের অন্যতম কারণগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবাদীরা আতঙ্কিত। কারন ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন এবং জীবাশ্ম জ্বালানিকে সমর্থন করেন। ট্রাম্পের বিগত চার বছরের শাসনকালে তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকার নাম তুলে নিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনে বিষয়টি তার কাছে ধাপ্পাবাজি বলে মনে হয় । ২০২৪ সালেও তাঁর সেই ধারণার পরিবর্তন হয় নি।। সেই জন্য অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী ট্রাম্পের ফিরে আসাকে জলবায়ুর জন্য কালো দিন বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্পের ফিরে আসা নরথ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের পক্ষেও আশংকাজনক বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি ন্যাটোর থেকে আমেরিকার নাম তুলে নেওয়ার পক্ষপাতি। ন্যাটোর একটা বড় খরচ বহন করে আমেরিকা। তাঁর বক্তব্য ইউরোপের দেশগুলির প্রতিরক্ষার জন্য আমেরিকা কেন অর্থ দেবে ? প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বামপন্থী রাষ্ট্র গুলিকে শায়েস্তা করার জন্য এই সংগঠনটি তৈরি করা হয়।। রাশিয়ার জন্য হয়তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ সুখকর হতে পারে। কারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করে সমর্থন যুগিয়ে চলেছে নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের সদস্য দেশগুলো।

ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃত্ববাদী প্রশাসক। অনৃত ভাষণে পারঙ্গম। তার একমাত্র লক্ষ্য আমেরিকাকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি মনে করেন আমেরিকা বিদেশিদের উপনিবেশ হয়ে উঠেছে। সেজন্য তার প্রধান কর্তব্য অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে বিতাড়িত করা। ২০১৬ সালে ক্ষমতায় এসে তিনি মেক্সিকানরা যাতে আমেরিকায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সীমান্ত বরাবর পাঁচিল তুলতে শুরু করেছিলেন। যদিও সে কাজ সম্পন্ন করতে পারেন নি । কিন্তু এবার অভিবাসীদের বিতাড়িত করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ট্রাম্প H১b ভিসার ব্যাপারে নতুন আইন আনতে চলেছে। ভারতীয়দের জন্য তা মোটেই সুখের হবে না। উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারতীয় সহ যে সকল বিদেশি আমেরিকাতে আছে বা যেতে চায় এবং যারা আমেরিকাতে চাকুরিরত ,তাদের এই আইন বিপদে ফেলতে পারে। আমেরিকার উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ন আত্মনির্ভরশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে ট্রাম্প পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ১৫ বৃদ্ধি করার পক্ষপাতি। এর ফলে ভারতের পণ্য রপ্তানির বাজার সঙ্কুচিত হবে। জো বিডেনের চার বছরের শাসনকালে আমেরিকার সঙ্গে ব্যবসায় ভারতের রপ্তানির থেকে আয়, আমদানির থেকে বেশি ছিল। কিন্তু যে হারে শুল্ক বৃদ্ধি হোতে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভারতের অর্থনীতির পক্ষে তা সুখকর হবে না।

চরম ইসরাইল পন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন, ইসরাইলের রাজধানী জেরুজালেমের স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেন। মার্কিন দূতাবাস ও তিনি জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁর এই ঘোষণা ব্যাপক সমালোচনা মুখে পড়ে। এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচন জেতার কারণে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু উল্লসিত। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভিনন্দন জানান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইসরাইলের সুসম্পর্ক বহুদিনের। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসায় ইসরাইল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

সর্বোপরি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসায় ভারতের উল্লসিত হবার কারণ নেই। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে বা রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে এ কথা কখনোই বলা সম্ভব নয়। স্বৈরাচারী ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখবে।তবে তার জন্য আমেরিকা বিপদে পড়বে না, এই গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করে,ডোনাল্ড ট্রাম্প যে অর্থনৈতিক নীতির পৃষ্ঠপোষক, অর্থাৎ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে বিতারণ, বিদেশি পণ্যের উপর ১৫ শতাংশ শুল্ক স্থাপন বা চীনের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বা তার বেশি শুল্ক স্থাপন, আমেরিকার অর্থনীতিকে বিপদেও ফেলতে পারে। আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি পেলে

মুদ্রাস্ফীতি বড় আকার ধারণ করতে পারে। এছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি কার্যকর করলে অদক্ষ শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে পারে। শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং পরিবহন প্রভৃতির পরিকাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী নীতি আমেরিকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে।

আর কবে? জবাব চায় জনতা
মণিপুর নিয়ে নিশ্চুপ কেন্দ্র

মিলন দত্ত

মণিপুরের জিরিবাম জেলায় ছ'জনের অপহরণ এবং খুনের বিচার চেয়ে ১৬ নভেম্বর রাতে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের বাড়ির সামনে পৌঁছে যায় উন্মত্ত জনতা। সে রাজ্যে প্রতিবাদ চলছে অনেকদিন ধরেই। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে শনিবার বিকেলেই ইম্ফলে কার্ফু জারি করে সরকার। তার পরেও বিক্ষোভ থামেনি। রাতে রাজ্যের দুই মন্ত্রী এবং তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এর পরেই উত্তেজিত জনতা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যায়। নিরাপত্তারক্ষীরা কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে কোনও রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। রাতে সে সময়ে বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি রাতে আর বাড়িতে ফেরেননি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দফতরেই রাত কাটান।

ওই দিনই মণিপুরের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সাপম রঞ্জন, উপভোক্তা বিষয়কমন্ত্রী এল সুসীন্দ্র সিংহ বিজেপি বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের জামাতা আরকে ইমো-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। হামলাকারীদের দাবি, জিরিবাম জেলায় ছ'জনকে খুন করায় অভিযুক্ত যাঁরা, তাঁদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিকেল সাড়ে ৪টে থেকে ইম্ফলে কার্ফু জারি করা হয়। ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর, চূড়াচাঁদপুর-সহ মোট সাত জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তাগত একাধিক বিধিনিষেধও জারি করা হয়েছে। তবে রাজধানীতে উত্তেজনা রয়েছে।

গত ১০ নভেম্বর রাতে জিরিবামে মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাম্বাই টেঙ্গল এবং ইউএনএলএফের যৌথ হামলায় মার জনজাতির এক মহিলা নিহত হওয়ার পরে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ওই ঘটনার জবাবে মার-কুকি বাহিনী মেইতেইদের বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকান জ্বালিয়ে দেয়। পুড়িয়ে মারা হয় দু'জন মেইতেই গ্রামবাসীকে। হামলা হয় থানায়। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের শিবিরেও হামলা চালানো হয়। গত ১১ নভেম্বরের ওই ঘটনায় সিআরপিএফ পাল্টা গুলি চালালে ১০ জন সশস্ত্র হামলাকারী নিহত হয়েছিলেন। সংঘাতের এই আবহে শনিবার জিরিবামের পাহাড়-জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ও আধাসেনার যৌথ দল।

গত ১২ নভেম্বর মণিপুরের জিরিবাম থেকে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও ছয় ব্যক্তি। এর আগের দিন 'বন্দুকযুদ্ধে' অন্তত ১১ জন সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গত কয়েক দিনে দফায় দফায় গুলি বিনিময়, বোমা বিস্ফোরণ, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা, বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু, মণিপুর রাইফেলসের দু'টি ব্যাটেলিয়নের অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্রশস্ত্র লুটের চেষ্টা-সহ একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অবস্থা সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও যৌথ বাহিনী।

এদিকে, শান্তি ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে নেমেছেন বহু মানুষ। ১০ নভেম্বর রাতে বিপুল সংখ্যক মহিলা ইম্ফলের রাস্তায় নামেন। রাজ্যে শান্তি ফেরানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা। এই আবহে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী যথারীতি বলেছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রশাসন সচেষ্ট। নিহত এক ব্যক্তির পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকাও তুলে দেন তিনি।

ড্রোনের সাহায্যে হামলা চালানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের সন্দেহ হামলাকারী সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি সম্প্রদায়ের। তারপর থেকে রাজ্যের একাধিক জায়গায় হামলা হয়েছে এবং কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশের সঙ্গেও কুকিদের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়েছে। দিল্লির মেইতেই আহ্বায়ক কমিটির সেরাম রোজেশ জানিয়েছেন মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু খুবই উদ্বেগজনক। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হস্তক্ষেপ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আভিযোগ, মেইতেই গোষ্ঠীর মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে। সাম্প্রতিক সময়ে আক্রমণের জন্য যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা কারা জোগান দিচ্ছে সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কুকি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় কর্মরত সংগঠনের পক্ষ থেকে হাতজালহই হাওকিপ পাল্টা আভিযোগ করেন, গত একবছরেরও বেশি সময় ধরে মণিপুরে কুকি গোষ্ঠীর মানুষের উপর যে অত্যাচার চলছে সে বিষয়ে রাষ্ট্র নীরব। তাঁরা দিল্লিতে কেন্দ্র সরকারকে তাঁদের অবস্থার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। তাঁদের বক্তব্য, এই মুহূর্তে মণিপুরে যা হচ্ছে তা খুবই চিন্তার। কুকিদের উপর অত্যাচার চলছে এখনও। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না।

ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভুয়ো পোস্টকে ঘিরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় চার মাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার পর পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে আবারও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে মণিপুরে। ইম্ফলের কৌব্রুক এলাকায় সশস্ত্র আক্রমণে এক মহিলা-সহ দুইজনের মৃত্যু হয়, আহত হন একাধিক ব্যক্তি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা পাহাড় থেকে কৌব্রুক ও পার্শ্ববর্তী কাদাংবন্দের নিচু এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালায়। হতাহতের পাশাপাশি বহু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশেই রয়েছে কুকি জনবহুল পার্বত্য জেলা কাংপোকপি। অভিযোগ সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরা কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত। এরপর থেকেই বারে বারে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মণিপুরের পরিস্থিতি। আগের সপ্তাহে মইরাংয়ে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা করা হয়। ওই ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পাশাপাশি মণিপুরের জিরিবাম জেলায় চারজন সন্দেহভাজন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য ও এক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। অসম সীমান্তবর্তী জিরিবামের মংবুং গ্রামের কাছে এই হামলা চালানো হয়। এই ঘটনার পর আরও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে এবং পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, রাজ্যে সাম্প্রতিক হিংসায় অত্যাধুনিক ড্রোন ও রকেট চালিত বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের অস্ত্র সাধারণত যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়। পুলিশ সন্দেহ করছে, বোমার বিস্ফোরণে ওই প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সেটি ছোড়া হয়েছিল সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মাইরেমবাম কোইরেঙের বাড়িকে লক্ষ্য করে। কাছাকাছি একটি জায়গায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই প্রবীণ। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। একাধিক জায়গায় গত সপ্তাহে একইরকমের বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পুলিশ জানিয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মণিপুর রাইফেলসের দু'টি ব্যাটেলিয়নের অস্ত্রাগার লুট করার চেষ্টা করা হয়। হামলাকারীদের রুখতে

কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং শূন্যে গুলি ছোড়া হয়। এদের মধ্যে একদল হামলাকারী পুলিশের উপর আক্রমণ চালায় যাতে দুজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রভাব জনজীবনে পড়ছে। রাস্তা-ঘাটে অতিরিক্ত পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে কয়েকদিন। বহু এলাকায় দোকানবাজার বন্ধ রয়েছে। রাজ্যপাল এল আচার্যর সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১৮ জন বিধায়ক। ইতিমধ্যে ইম্ফলে পুলিশের ডিজি, নিরাপত্তা উপদেষ্টা-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ইস্তফার দাবিতে রাজভবনের দিকে রওয়ানা দেয় মণিপুরের স্কুল এবং কলেজের কিছু পড়ুয়া। আধাসামরিক বাহিনী প্রত্যাহার এবং নৈতিক কারণে ৫০ জন বিধায়কের পদত্যাগও দাবি করেন তাঁরা। রাজভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভও করেন।

ধনমঞ্জরি স্টুডেন্ট ইউনিয়নের বক্তব্য, খাঁচায় থাকা আর ইম্ফলে থাকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এই বার্তা বোঝানোর জন্য তাঁরা মিছিল করছেন। কুকিরা জানিয়েছে, তাদের কাছে যে অস্ত্র রয়েছে তা দিয়ে তারা ২০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করে ইউনিফায়েড কমান্ড জারি করার কথাও জানান তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করে সোচ্চার হয়েছেন অনেকেই। বিরাট সংখ্যক মহিলা রাস্তায় নেমে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তার ইস্তফা দাবি করেছেন।

মণিপুরে অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া ভাষায় চিঠি লিখেছেন মণিপুরের কংগ্রেস বিধায়ক বিমল আকোইজাম। রাজ্যে হিংসা ও সংঘর্ষ রুখতে শাহ-র কাছে 'কার্যকরী ব্যবস্থা' নেওয়ার দাবি জানালেন তিনি। চিঠিতে ঠিক কী বলেছেন বিধায়ক? শাহকে লেখা চিঠিতে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতিকে 'বেনজির হিংসা' বলেছেন আকোইজাম। লিখেছেন, বর্তমান অবস্থা ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের স্মৃতিকে জাগিয়া তুলছে। কটাক্ষের স্বরে কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, মণিপুরে যা চলছে তা গুজরাটে হলে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। সেক্ষেত্রে কী করতেন? প্রশাসনের নজরদারি সত্বেও এত বড় সংকট দুঃখজনক। আরও লিখেছেন, বেদনার সঙ্গে আপনাকে মনে করাতে বাধ্য হচ্ছি, একটানা হিংসায় কয়েক শো মানুষের মৃত্যু হয়েছে, ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন। অসংখ্য মণিপুরবাসী ত্রাণশিবিরে দিন কাটাচ্ছেন।

ভয়ংকর সব অস্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে। আকাশ পথে ড্রোন ব্যবহার হচ্ছে। রকেট বা ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও হচ্ছে। এইসঙ্গে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে তোলাবাজির মতো অপরাধ চলছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এই পরিস্থিতি চলায় রাজ্যের অর্থনীতিও ভেঙে পড়েছে। কংগ্রেস বিধায়কের প্রশ্ন, দিনের পর দিন এমন হিংসা, সংকট পরিস্থিতি কি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের মতো 'মূল' ভারত-ভূখণ্ডে চলতে দেওয়া হত? চিঠির শেষ অংশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রকৃত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান কংগ্রেস বিধায়ক। তিনি দাবি করেন, হিংসায় লাগাম টানতে ঠিক ভাবে ব্যবহার করা হোক নিরাপত্তা বাহিনীকে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা বিদেশিরা সংঘর্ষে ইন্ধন দিচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা হোক, মাদক মাফিয়ারা জড়িত কিনা, তাও দেখা হোক। তাঁর আর্জি, যেভাবেই হোক শান্তি ফেরানো হোক মণিপুরে।

প্রসঙ্গ : ঋত্বিক ঘটক
- তানভীর মোকাম্মেলের সাক্ষাৎকার

{ বাংলা ও ভারতীয় চলচ্চিত্রের নতুন ধারার পরিচালক ঋত্বিক ঘটক শতবর্ষে পদার্পণ করলেন। তাঁর জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায়। তাঁর চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও লেখক তানভীর মোকাম্মেল। তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করার জন্য সুশীল সাহা ও শিশির রায় কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। - সম্পাদক নাগরিক }

প্রশ্ন ১ - স্বয়ং সত্যজিৎ রায় এক স্মরণসভায় বলেছিলেন যে যথাসময়ে 'নাগরিক' মুক্তি পেলে নতুন ধারার বাংলা ছবির পথিকৃতের সম্মান ঋত্বিকই পেতেন। বলাবাহুল্য 'পথের পাঁচালী'-র কথা মনে রেখেই কথাগুলো তিনি বলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আপনার নিজস্ব মতামত কি? আপনি কি মনে করেন ১৯৫২ সালে নির্মিত 'নাগরিক' যথাসময়ে মুক্তি পেলে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হোত? ছবি হিসেবে 'নাগরিক'-কে আপনি কোন মর্যাদায় অভিহিত করতে চান?

তানভীর মোকাম্মেল - আমার ধারণা সত্যজিৎ রায় কথাটা বিনয়ের অবস্থান থেকেই বলেছিলেন। 'নাগরিক' ছবির অনেক শক্তিশালী দিক ছিল। যেমন এর বিষয়বস্তু। সদ্য দেশভাগ-উত্তর উদ্বাস্তু মানুষদের দারিদ্র্য ও অসহায় জীবনের দুসহ চিত্রকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ঋত্বিকের গভীর আন্তরিকতা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে তখনও পর্যন্ত বাংলা সিনেমার যে সব দুর্বলতা, যেমন স্টুডিওর ভেতরে অধিকাংশ শুটিং করা, কৃত্রিম লাইটের অতিরিক্ত ব্যবহার, অভিনয়ে অতি নাটকীয়তা, এসব 'নাগরিক' ছবিটাতেও যথেষ্টই ছিল। যদিও আমরা পরে জানব যে অভিনয়ের এই অতিনাটকীয়তার ব্যাপারটা ঋত্বিক ঘটক ওঁর ছবির একটা নিজস্ব ঘরানা বা রীতি হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। হয়তো ওঁর মনে হয়েছে অভিনয়ে এই অতিনাটকীয়তা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের বাঙ্গালীদের সংস্কৃতিরই একটা উপাদান। তাছাড়া উনি নাট্য-আন্দোলন থেকে সিনেমার জগতে এসেছিলেন। ফলে মঞ্চনাটকের নানা দিক, বিশেষ করে

অভিনয়রীতির, একটা প্রভাব হয়তো ওঁর ওপর ছিল। বলেছেনও;'Melodram is also an art form'। অতিনাটকীয়তা তাই ঋত্বিকের শিল্পবিশ্বাসেরই একটা অংশ ছিল।

পক্ষান্তরে নিও-রিয়ালিস্ট আঙ্গিকে তৈরী 'পথের পাঁচালী' অনেক পরিশীলিত ও সুনির্মিত একটা চলচ্চিত্র। 'পথের পাঁচালী'-র Mise-en-scene-গুলো চমৎকার। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার নান্দনিকতা তো অসামান্য। শেষ বিচারে সিনেমা তো ক্যামেরা বা সিনেমাটোগ্রাফিরই শিল্প। ছবিটার সেট ও প্রপসের ব্যবহারও তো সব মহলেই উচ্চ প্রশংসিত। আর 'পথের পাঁচালী'-র আবহসঙ্গীতও খুবই নান্দনিক। এছাড়া 'পথের পাঁচালী' ছবিটার চরিত্রচিত্রণও ছিল অনেক সূক্ষ্ম স্তরের। অবশ্য এসব বাস্তব চরিত্রগুলো সৃষ্টিতে বিভূতিভুষণের সাহিত্য-প্রতিভারও একটা বড় ভূমিকা ছিল। তবে চরিত্রগুলোকে পর্দায় মানবিক বিশ্বস্ততায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় অসাধারণ দক্ষতা ও বিবেচনাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সে তুলনায় তনাগরিকদ-য়ের ক্যামেরার কাজ গতানুগতিক, অভিনয় অতি ভাবপ্রবণ এবং অধিকাংশ দৃশ্য স্টুডিওর ভেতরে কৃত্রিম লাইটে শুট করা, যেগুলো সে আমলে ছিল টালিগঞ্জে তৈরী সব ছবিরই স্বাভাবিক সব প্রবণতা। দুর্বলতাও। তাই 'নাগরিক'-কে 'পথের পাঁচালী'-র উর্ধ্বে স্থান দেওয়াটা হয়তো বাঙ্গালীর অতিকথন। তবে আমি মনে করি ঋত্বিক ঘটকের মতো অসামান্য এক চলচ্চিত্রনির্মাতার প্রথম ছবি হিসেবে 'নাগরিক' ছবিটার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব সব সময়ই রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২ - ঋত্বিক ঘটকের দ্বিতীয় ছবি 'অযান্ত্রিক' মুক্তি পায় ১৯৫৮ সালে। ছবিটা সেই সময়ে জনাদৃত হয়নি। ছবির বিষয় ও নির্মাণ ওই সময়ের থেকে এগিয়ে ছিল বলেই অনেকে মনে করেন। আপনারও কি সেই একই ধারণা? দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা নাকি প্রকৃত শিল্পরসিকের স্বীকৃতি, একটি ছবির মূল্যায়নে কোনটা বেশি জরুরি? ঋত্বিক ঘটকের তঅযান্ত্রিকদ ছবির যথার্থ মূল্যায়ন আমরা কি করতে পেরেছি?

তানভীর মোকাম্মেল - জনপ্রিয়তা ও শিল্প-সার্থকতা তো এক জিনিষ নয়। কোনও ছবি জনপ্রিয় হলেও শিল্প হিসেবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীরও হতে পারে। যেটা তশোলেদ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন। আবার কোনও চলচ্চিত্র খুব শিল্প-সার্থক হলেও জনপ্রিয় না-ও হতে পারে। যেমন সত্যজিৎ রায়েরই অসামান্য শিল্পিত এক চলচ্চিত্র তঅপরাজিতদ ততটা জনপ্রিয় ছিল না। জনপ্রিয়তা ও শিল্প-সার্থকতা তাই দু'টো ভিন্ন বিষয় এবং এ দুইয়ের বিচারের মাপকাঠিও ভিন্ন।

তবে যে কোনো মাপে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' এক অনন্য সৃষ্টি। শুধু ভারতীয় চলচ্চিত্রে নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রেও। মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে যে আন্তসম্পর্ক তা তো আজ দুনিয়া জুড়েই এক আলোচনার বিষয়। সেই ১৯৫৮ সালে বাংলায় বসে ঋত্বিক ঘটক যে এমন একটা বিষয় নিয়ে ছবি করেছিলেন সেটা ওঁর প্রতিভা ও শিল্প-গভীরতারই পরিচায়ক। আর 'অযান্ত্রিক' ছবিটার নির্মাণও খুবই দক্ষ হাতের কাজ। গোটা ছবিটাই প্রায় আউটডোরে শুট করা। ঝাড়খন্ড-পুরুলিয়ার ল্যান্ডস্কেপকে ঋত্বিক ওঁর ক্যামেরায় যে অসামান্য নান্দনিকতায় তুলে ধরেছেন তা চলচ্চিত্রে ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা টেক্সট ফিল্মের উদাহরণ হতে পারে। তাছাড়া আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে ড্রাইভার বিমল ও ওর তজগদ্দলদ গাড়ীটার যে মনস্তাত্ত্বিক আন্তসম্পর্ক তাও তো সমাজ-বিজ্ঞানীয় এক গবেষণার বিষয়। আর ছবিটার শেষ দৃশ্যটা তো আজীবন মনে গেঁথে রইবে। বিমলের প্রিয় তজগদ্দলদ গাড়ীটাকে ভেঙ্গে স্ক্রাপ হিসেবে কিনে নিয়ে যাচ্ছে এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী। পাশে গীর্জার এক ক্রশ। বিমল অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন ক্রশবিদ্ধ এক যীশু! লোভ ও ফিলিস্টাইনিজমের হাতে নিহত এ যুগের এক যীশুই যেন হয়ে ওঠে ক্ষ্যাপাটে ড্রাইভার বিমল। শুধু বাংলা চলচ্চিত্রে নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রেই মনে এমন দাগ কাটা ও গভীর অর্থবহ শেষ শট খুব কমই আছে।

ছবিটাতে শব্দের কাজও ছিল খুবই উঁচু মাপের। 'জগদ্দল' গাড়ীটার নানা শব্দ, হর্ণের ব্যবহার, বুলাকি পাগলের টিনের থালার আওয়াজ, ট্রেনের শব্দ, সব কিছুরই খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও সৃজনশীল ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক। শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওই দৃশ্যটা তো অতুলনীয়। মেয়েটা ট্রেনে করে চলে যাচ্ছে। বিমল হাতে টিকিট নিয়ে প্লাটফর্মে 'টিকিট.. টিকিট' বলতে বলতে ছোটে। ট্রেনের চাকার আওয়াজের কারণে আমরা পরিষ্কারভাবে শুনতে পাই না মেয়েটা বিমলকে ঠিক কী বলতে চাইছিল। এক সময় ট্রেনের তীব্র শব্দে হারিয়ে যায় মেয়েটার ক্ষীণ কণ্ঠ। একই সঙ্গে হারিয়ে যায় বিমলের জীবনে কোনো নারীর প্রেম, রোমান্স ও গৃহী হওয়ার সব সম্ভাবনা। সাউন্ডট্রাকে শব্দ ব্যবহারের অসামান্য এক শৈল্পিক ব্যবহারের উদাহরণ এ দৃশ্যটা।

দর্শকেরা সে যুগে, বা বর্তমানেও, 'অযান্ত্রিক'-কে যেভাবেই নিক না কেন, এ ছবিটা শুধু বাংলা নয়, বিশ্ব চলচ্চিত্রেই এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। বিষয়বস্তু ও নির্মাণশৈলীতে 'অযান্ত্রিক' নিঃসন্দেহে সে যুগের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে থাকা এক ছবি। আসলে বাঙ্গালী দর্শকের চলচ্চিত্র-চেতনার মান তো গত শতকের পঞ্চাশের দশকে তেমন উন্নত ছিল না। এ যুগে নির্মিত হলে তঅযান্ত্রিকদ ছবিটা নিশ্চয়ই বিদগ্ধ দর্শকদের আরো সমর্থন পেত। এবং আমি মনে করি তঅযান্ত্রিকদ ঋত্বিকের চলচ্চিত্রমালায় চিরকালই এক উজ্জ্বল মুক্তা হয়ে রইবে।

প্রশ্ন ৩ - ঋত্বিক ঘটকের পরের ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯) একেবারেই ভিন্নধারার ছবি। ছবিটা কি আপনি শিশুতোষ আখ্যা দিতে চান? ছবিটা কি সত্যি সত্যিই ঋত্বিক ঘরানার বাইরে নাকি এ ছবিরও একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে?

তানভীর মোকাম্মেল - ঋত্বিক ঘরানার বাইরে কেন হবে? কেননা

বাড়ীর বাইরের হাতছানি ও পলায়ন, নতুন বাড়ীর সন্ধান, স্বাধীনতার অন্বেষা, এসবই তো ঋত্বিকের চলচ্চিত্র-ভাবনার এক বড় অংশ। ছবিটাতে শিশুতোষ উপাদান অনেকই আছে। কিন্তু ঋত্বিক যেভাবে এ ছবির মধ্য দিয়ে বালক কাঞ্চনের মুক্তির আকাঙ্খাটাকে দেখিয়েছেন তা যেন তার স্রষ্টারও মুক্তির আকাঙ্খা হয়ে ওঠে। হয়তো আমাদেরও আকাঙ্খার।

ছবিটার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ছবিটাতে কলকাতা মহানগরের নীচুতলার সাব-অলটার্ন মানুষদের কিছু চরিত্র ও জীবনযাপনকে ঋত্বিক যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে সে সময়কার সমাজ-বাস্তবতার একটা চিত্রও যেন খুব সফলভাবেই তিনি তুলে ধরলেন। তাছাড়া বালক কাঞ্চনও এক সময় উপলব্ধি করে এ মহানগর কোনো কল্পলোকের স্বর্গ নয়, এক কঠিন জীবন-সংগ্রামের জায়গা। সে দিক থেকেও ছবিটার একটা সামাজিক-ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়ে যাবে।

প্রশ্ন ৪ - পরের ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'-তে (১৯৬০) আমরা এক অন্য ঋত্বিককে খুঁজে পাই। প্রকৃত অর্থে ঋত্বিক ঘটকের মননে ও চিন্তনে জুড়ে ছিল দেশভাগের যে যন্ত্রণা, তার এক যথার্থ রূপায়ণ যেন এই ছবিটা। কিছুটা হলেও এই ছবিটা বাণিজ্যসফল। তমেঘে ঢাকা তারাদ ছবিটা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

তানভীর মোকাম্মেল - ছবি বাণিজ্যসফল হওয়া তো দোষের কিছু নয়। দেখবার বিষয় বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রনির্মাতা শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনও রকম সমঝোতা করেছেন কী-না। আপনি-আমি জানি যে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করার মানুষ ঋত্বিক ছিলেন না। ওঁর শিল্পী হৃদয় যা বলতে চেয়েছে উনি সব সময়ই সেটা সৎভাবে বলেছেন।

আমার বিবেচনায় 'মেঘে ঢাকা তারা' ঋত্বিক ঘটকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ওঁর সকল শৈল্পিক যন্ত্রণার যে মূল বিষয়টা, বাংলা ভাগের গভীর ক্ষত, তা এ ছবিতে খুবই বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। তমেঘে ঢাকা তারাদ ছবিটার ক্ষেত্রে অনেক অনেক ইতিবাচক কথা বলা যাবে। যেমন সাদা-কালো সিনেমাটোগ্রাফিতে আলো - ছায়ার চমৎকার ব্যবহার, অসামান্য কিছু ক্লোজ আপ, সাউন্ডট্রাকে আবহসঙ্গীত ও নানা রকম এফেক্ট সাউন্ডের অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সফল কিছু ব্যবহার। ছবিটার অভিনয়ের মানও বেশ উঁচু মাপের। যদিও কেউ কেউ অতিনাটকীয় অভিনয় করেছেন, তবে আমরা এতদিনে জানি অভিনয়ে মেলোড্রামাটিক এই ধারাটা ছিল ঋত্বিকের চলচ্চিত্রভাবনারই এক ধরণের নিজস্ব প্রকাশ। সব মিলিয়ে বলব 'মেঘে ঢাকা তারা'-য় অভাগিনী নীতার মাধ্যমে যে গভীর বেদনার আর্তি ঋত্বিক ঘটক ফুটিয়ে তুলেছেন তা যুগ যুগ ধরেই বাঙ্গালীকে বেদনার্ত করে যাবে। গভীর দুখবোধ সৃষ্টি করাটা শিল্পের অন্যতম এক কাজ। আর সেদিক থেকে একজন নির্মাতা হিসেবে ঋত্বিক ঘটক 'মেঘে ঢাকা তারা'-তে খুবই সফল।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটা বহুস্তরীয়, যে বহুস্তরীয় হওয়াটাও, যে কোনো বড় মাপের শিল্পের এক অপরিহার্য দিক। ছবিটার গল্পের বয়ানে একটা দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারের চিত্র আঁকার পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটক গভীর অর্থবহ কিছু পৌরাণিক ইঙ্গিতও যেন রেখে যান। বিশেষ করে নীতা চরিত্রটার মাধ্যমে। নীতা, যে পাহাড়ে যেতে চেয়েছিল, এবং একদিন পাহাড়েই সে আবার ফিরে গেল, যেন একালের এক পার্বতীই। এবং নীতার শটগুলোতে সাউন্ডট্রাকে 'আয়রে উমা ফিরে আয়' গানটার অর্থবহ ব্যবহারে বাঙ্গালীর গৌরীদানের বেদনা ও মা দুর্গার আসা ও ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিতটা বেশ চমৎকারভাবেই ফুটে উঠেছে। নীতার জন্মদিনও যে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন তাও তো পৌরাণিক অর্থবহই। পৌরাণিক মীথের ইঙ্গিতগুলো তমেঘে ঢাকা তারাদ চলচ্চিত্রটার খুবই শক্তিশালী একটা দিক এবং তা ছবিটাকে একাধিক মাত্রা এনে দিয়েছে।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির ক্যামেরার কাজও খুব উঁচু স্তরের। একটা শটের কথা বলি। ব্যর্থ পিতা যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে বলে 'I accuse'। কাকে? সেটা আর বলেন না। অসহায়ের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে ঋত্বিকের ক্যামেরা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে প্রৌঢ় পিতার সামনের দিকে বাড়ানো তর্জনীর আঙ্গুলটাকে এমনভাবে ধরে যা প্রায় একটা নরম লিঙ্গের মতো ক্যামেরার সামনে যেন অসহায়ের মতো ঝুলতে থাকে। এ যেন এক অক্ষম পিতার ব্যর্থ ক্ষোভের বহিপ্রকাশ! ইঙ্গিতটা খুবই অর্থবহ। এবং সিনেমাটিকও।

প্রশ্ন ৫ - পরের ছবি 'কোমল গান্ধার'- এ (১৯৬১) ঋত্বিক ঘটকের অন্তস্থিত দেশভাগের যন্ত্রণার পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের ভাঙনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উপরোক্ত দু'টো বিষয়ের মধ্যে সাযুজ্য কোথায়? দর্শকদের তিনি কোন্ বার্তা দিতে চেয়েছিলেন? ছবিটা আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক? কেন?

তানভীর মোকাম্মেল - থিয়েটার গ্রুপের ভাঙনের সঙ্গে বাংলা ভাগের একটা প্রতিতুলনা তকোমল গান্ধারদ ছবিটাতে রয়েছে। যদিও তা দৃশ্যে ও সংলাপে সর্বদা তেমন পরিস্ফুট নয়। তবে অনুসূয়া চরিত্রটার মাঝে গণনাট্য সংঘের দুই গ্রুপের বিভক্তির বেদনা ও তাদের মিলনের জন্যে অনুসূয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টার মাঝে দুই ভাঙ্গা বাংলার মিলনের ঋত্বিকের আকাঙ্খাটা যেন কখনও কখনও মূর্ত হয়ে ওঠে। ভৃগু অনুসূয়াকে পদ্মার পারে দাঁড়িয়ে বলেছিল তার দেশ ছিল এ নদীর ওপারে পূর্ববঙ্গে এবং আমরা দেখি বন্ধ রেল-লাইনে বাফারের সেই অসামান্য ইমেজটা। এ পথে ট্রেন আর পূর্ববঙ্গে যায় না! দৃশ্যটা দেশভাগের যন্ত্রণার থীমটাকে যেন এক বুকচেরা গভীরতায় মেলে ধরে। ইমেজে ও সাউন্ডট্রাকে দৃশ্যটা এতই বাঙ্ময় যে ঋত্বিক ঘটক ওঁর তকোমল গান্ধারদ ছবিটাতে ঠিক কী বলতে চয়েছেন তা যেন ওই একটা দৃশ্যেই যথেষ্ট বলিষ্ঠভাবে ফুটে ওঠে।

তবে 'কোমল গান্ধার' ছবিটার দুর্বলতা হচ্ছে এর বয়ানের কাঠামোটা। কোনো কোনো দৃশ্য অতিরিক্ত দীর্ঘ মনে হয়। দৃশ্যগুলো কোথায় কাটতে হবে ঋত্বিক যেন তা ভুলে গেছেন! অনেক সময় চরিত্রদের সংলাপের চালাচালিতে উনি নিজেই যেন জড়িয়ে পড়েছেন। শিল্পীর নিজের Self-indulgence শিল্পের কোনো বড় গুণ নয়। তাছাড়া ছবিটার কোনো কোনো দৃশ্যে কথার পরিমাণটাও বেশী। অনেকটা 'টকীজ' সিনেমাগুলোর মত। সিনেমা মূলত ইমেজ বা চিত্রকল্পের মাধ্যম। চরিত্রদের বেশী কথা বলা যে কোনো চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মানকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তকোমল গান্ধারদ-কেও করেছে। 'কোমল গান্ধার' ছবিটার অনেক অনেক নান্দনিক দিক থাকলেও সম্পাদনার কিছু দুর্বলতা, অনেক বেশী দৈর্ঘ্য ও অতিরিক্ত কথার কারণে ছবিটা আধুনিক সংবেদনশীলতার দর্শকেরা দেখতে দেখতে হয়তো হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। মনে মনে ভাবতে পারেন ছবিটা কখন শেষ হবে! সম্পাদনার এই অগোছালো ব্যাপারটা ঋত্বিকের আরো দু'একটা ছবিতেও লক্ষ্য করা যায়। যা ছবিগুলোকে নিটোল শিল্পকর্ম হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে 'কোমল গান্ধার'- এ এই প্রবণতাটা বেশী।

প্রশ্ন ৬ - 'সুবর্ণরেখা'তে (১৯৬২) ঋত্বিক ঘটকের নির্মাণ কিছুটা মেলোড্রামাটিক এবং উচ্চকণ্ঠ। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে ঋত্বিকের দেশভাগের যন্ত্রণার আর এক চিত্র আমরা ছবিটাতে দেখতে পাই। এই ছবিটা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

তানভীর মোকাম্মেল - শেষের পাঁচ-ছয় মিনিট বাদে 'সুবর্ণরেখা'-কে আমার কখনোই খুব উচ্চকিত বা মেলোড্রামাটিক ছবি বলে মনে হয়নি। বরং বেদনার সুরটা এ ছবিটাতে খুব সূক্ষ্ম তারেই বাঁধা এবং বিষণ্নতার সে সুর ছবিটা শেষ করার পরও দর্শকদের মনের ভেতরে অনুরণিত হতেই থাকে।

আমি মনে করি 'সুবর্ণরেখা' ঋত্বিক ঘটকের অন্যতম সেরা ছবি। বাংলা সিনেমারও। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা', দেশভাগ নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের এ তিনটে ছবি, যাদেরকে একত্রে দেশভাগ-ট্রিলজী বলা হয়, তাদের মধ্যে 'সুবর্ণরেখা' ঋত্বিকের এক মুক্তাসম সৃষ্টি যা যুগ যুগ ধরেই দর্শকদের মন এক গভীর বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন করে রাখবে। এরিস্টটল শিল্পের সংজ্ঞায় ওই যে 'করুণা'-র কথা বলেছিলেন, 'সুবর্ণরেখা' ছবিটা দর্শকের মনে সেই করুণার রসটা খুবই সফলভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। হয়তো ঋত্বিকের অন্য অনেক ছবির চেয়ে অনেক বেশীই পেরেছে। সমতুল্য কেবল হয়তো 'মেঘে ঢাকা তারা'।

তবে 'সুবর্ণরেখা'-তে বিষণ্নতার এক বড় কারণ হচ্ছে কেবল দেশভাগ নয়, চরিত্রদের নৈতিক পরাজয়ও। মূল প্রটাগনিস্ট ঈশ্বর তো বরাবরই ছিল কিছুটা সুবিধাবাদী ও পলাতক মধ্যবিত্ত চরিত্রের মানুষ। ফলে তার নৈতিক অধপতন আমাদেরকে অতোটা ব্যথিত করে না। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ হরপ্রসাদও যখন জীবনে সব হারিয়ে, টাকার বিনিময়ে কলকাতার এলিট সমাজের ভবীভৎস মজাদ লুটতে চায়, তখন এ সমাজ, মূল্যবোধ, ও মানবপ্রজাতির ব্যাপারেই আমরা যেন কিছুটা হতাশ ও নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়ি। এদের নৈতিক পরাজয় ও সীতার আত্মহত্যা গোটা ছবিটার শরীরেই বিষাদের এমন এক চাদর যেন ঢেকে দেয় যে বিষণ্নতা ছবিটা দেখার পর থেকে দীর্ঘ দিনই দর্শকের মনকে ছেয়ে রাখে।

শেষ জীবনে হরপ্রসাদের অতি তিক্ত এই উপলব্ধি যে 'আমরা সব বায়ুভূত নিরালম্ব' হয়ে যাব তখন মৃত্যুচিহ্নিত এই মানবজীবনের বিষাদ যেন একটা মহাজাগতিক (Cosmic) রূপ পেয়ে যায়, যে বিষাদ থেকে সমগ্র মানবজাতিরই যেন কোনো মুক্তি নেই। তবে কেবল এটুকু বললে ঋত্বিক ঘটককে একজন নৈরাশ্যবাদী শিল্পী হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেত। কিন্তু ঋত্বিক তো শেষ পর্যন্ত আশাবাদীই থাকতে চেয়েছেন। 'অযান্ত্রিক'-য়ের শেষ দৃশ্যটার কথা ভাবুন। ভাঙ্গা জগদ্দল গাড়ীটার পাশে গাড়ীটার হর্ণটা বাজাতে থাকে এক মানবশিশু। 'তিতাস'-য়ে শেষ দৃশ্যে উন্মুক্ত ধানক্ষেতে ভেঁপু বাজিয়ে ছুটে যায় আরেক মানবশিশু। মানুষের জীবনচক্র, Cycle of life, চিরপ্রবাহমান। তা চলতেই থাকে। মানুষকে বড় রকম ধাক্কা দিতে, মানুষের মাঝে গভীরতম করুণা জাগাতে, বেদনার রসটাকে 'সুবর্ণরেখা'-তে তিনি সবচেয়ে গভীরভাবে ঢেলেছেন এটা সত্য। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষ ও জীবনের ব্যাপারে ঋত্বিক আশাবাদীই থাকতে চেয়েছেন।

আসলে ঋত্বিক ঘটকের জীবনবীক্ষার একটা দর্শনগত দিক আছে। ঋত্বিক ঘটক জীবন শুরু করেছিলেন একজন মার্কসবাদী হিসেবে। কিন্তু এক সময় ইয়ুঙ্গের অবচেতন মনের তত্ত্বটার প্রভাব ওঁর উপর বেশী পড়ে। একটা Primordial Archetype হিসেবে "Mother Image"-য়ের ধারণাটা ওঁকে বেশ আকর্ষণ করত বোঝা যায়। এই মাদার-ইমেজের আবার দু'টো রূপ;একটা ধ্বংসাত্মক রূপ, যেটা 'সুবর্ণরেখা'-তে পরিত্যক্ত বিমানবন্দরটায় বালিকা সীতার সামনে বহরূপীর ওরকম মা কালীর রূপ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার দৃশ্যটাতে আমরা দেখতে পাই। আর দ্বিতীয় রূপটা স্নেহময়ী মাতৃত্বের। মাতৃত্বের লালন-পালনের সে পবিত্র দিকটা 'সুবর্ণরেখা' ছবিটাতে রয়েছে। সীতা এক সময় ওর দাদা ঈশ্বরকে বলেও শুনি; 'আমি তো তোমার মাই।' পবিত্র মাতৃত্বের প্রতি এই আকাঙ্খা যেন ঋত্বিকের এক অবচেতন শৈল্পিক আকাঙ্খা। তবে এ মা তো কেবলই এক নারী নয়, বাংলা নামের জন্মভূমিটাই যেন একটা মাদার-ইমেজ হিসেবে ঋত্বিকের ছবিতে বারবারই এসেছে। পর্দায় ও সাউন্ডট্রাকে। একটা Leit-motif-য়ের মতো। স্বদেশকে বা বাংলা মাকে দেখার ক্ষেত্রে এই Mother Image -য়ের ধারণাটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিতে বঙ্গবালা চরিত্রে বেশ বড়ভাবেই চোখে পড়ে। 'কোমল গান্ধার'-য়ে

অনুসূয়া ও 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার মাঝেও সেটা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আর 'তিতাস একটি নদীর নাম'-য়ে বালক অনন্তর কাছে তার মা তো সাক্ষাৎ ভগবতীই! সে যখন মায়ের কথা ভাবে তখন জগদ্ধাত্রী মা দুর্গার মূর্তিটাই তার চোখের সামনে ভেসে আসে। তবে 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পো' ছবিটার বঙ্গবালার কথা বিশেষভাবেই বলব, কারণ ছবিটাতে বঙ্গবালার বরাতে বারবারই বাংলা মায়ের কথা দৃশ্যে ও সংলাপে, নানাভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকী অনেক ভিন্ন বিষয়ের একটা ছবি হলেও 'অযান্ত্রিক' ছবিতেও বিমলের পুরনো 'জগদ্দল' গাড়ীটাও যেন কখনও কখনও সর্বংসহা এক মায়েরই প্রতীক হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৭ - পরের ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) মুক্তি পায় আগের ছবির অনেক দিন পরে। ইতোমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন। 'রঙের গোলাম' নামের একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যরে ছবির কাজ শুরু করেও বেশি দূর এগোতে পারেননি। ইতোমধ্যে (১৯৭১) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীন দেশে গিয়ে বহু পরিশ্রমে ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করেন এপিকধর্মী চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩)। ছবিটা বাংলাদেশের প্রকৃতি এবং ওখানকার অভিনেতাদের প্রাণঢালা অভিনয়ে সমৃদ্ধ। এ ছবিটা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

তানভীর মোকাম্মেল - অদ্বৈত মল্লবর্মনের কাহিনীটার মধ্যেই এপিক উপাদানটা ছিল। ঋত্বিক মূল উপন্যাসটার অনেক কিছু পাল্টালেও কাহিনীটার ওই এপিকধর্মিতা খুব ভালোভাবেই বজায় রেখেছিলেন। বরং বলা চলে সেটাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তবে উপন্যাসটার মত ঋত্বিকের চলচ্চিত্রটাও ঠিক আটসাঁট কোনো ধ্রুপদী এপিক নয়, বরং এক ধরণের এলায়িত লোকজ এপিক। যেখানে কাহিনীর বয়ানটা ঠিক গ্রীক এপিক নাটকগুলোর মত দৃঢ় সংবদ্ধ নয়, বরং কিছুটা ছাড়া ছাড়া ভাবেই বলা হয়েছে গল্পটা। ছবিটার সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিল বোঝা যায়। আসলে ছবিটা শেষ করার সময় ঋত্বিক ঘটক তো ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সম্পাদনার বিষয়টা নিজে তেমন তদারকী করতে পারেননি।

তবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটার এক বড় সম্পদ হয়ে রইবে এর সিনেমাটোগ্রাফি। চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম অসাধারণ কাজ করেছেন। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের প্রকৃতিকে এত চমৎকার নান্দনিকতায় খুব কম চলচ্চিত্রেই আমরা দেখেছি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা,বিশেষ করে রোজী সামাদ, কবরী সারোয়ার, রওশন জামিল, এঁরা বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। আমি মনে করি ঋত্বিকের Ouevre-তে, এবং বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও, 'তিতাস একটি নদীর নাম' সব সময়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে রইবে।

প্রশ্ন ৮- পরের ছবি এবং শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' (১৯৭৪) ঋত্বিক ঘটকের আত্মজৈবনিক নির্মাণ হলেও ছবিটি দেশ কাল সমাজের দর্পণ হয়ে ওঠে। এই ছবিটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

তানভীর মোকাম্মেল - ঋত্বিকের সব ছবির মধ্যে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-ই ওঁর সবচেয়ে বেশী আত্মজৈবনিক ছবি। যে কোনও Auteur চলচ্চিত্রনির্মাতার ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিকই যে নির্মাতার জীবনের নানা ছাপ তাঁর ছবির পর্দায় ফুটে উঠবে। কিন্তু 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিটায় ঋত্বিক নিজে সশরীরে পর্দায় উপস্থিত থেকে যেভাবে নিজের বলবার কথাগুলো দর্শকদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বলেছেন তা খুবই ব্যতিক্রমী এবং ছবিটাকে তা করে তুলেছে পুরোপুরিই ঋত্বিকময়। সেই আবেগায়িত সংলাপ, বিচ্ছিন্ন স্বদেশভূমির জন্যে সুগভীর এক বেদনার আর্তি, বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি তীব্র এক ক্ষোভ, নিজের অ্যালকোহল আসক্তি এবং তৎজনিত শারীরিক অসুস্থতা, এসবই এ ছবিটাতে খুবই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। আমার মনে হয়েছে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'-ই সবচে বেশী ঋত্বিকীয় একটা ছবি। মানে এ ছবিটা দেখলেই শিল্পী ও মানুষ ঋত্বিক ঘটককে সবচে বেশী বোঝা যায়। তাছাড়া ১৯৭০ দশকের পশ্চিমবঙ্গ, তার নক্সাল আন্দোলন, তার হতাশা, এসব কিছুই এ ছবিটার শরীরে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিটা যেন সে সময়কালেরই একটা দর্পণ হয়ে ওঠে।

বাংলা মা, যা এখন খন্ডিত, তার প্রতি ঋত্বিকের ভালোবাসার আবেগময় প্রকাশ 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিটাতে খুবই প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। আগেও বলেছি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নারী বঙ্গবালা যেন হয়ে ওঠে সেই ভাঙ্গা বাংলা মায়েরই এক দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্প। ঋত্বিক খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন ওই গানটা অকেন চেয়ে আছ গো মাদ। সাউন্ডট্রাকে এ গানটা চলার সময় আমরা একাধিকবারই দেখি নীলকণ্ঠরূপী ঋত্বিক ঘটক ও বঙ্গবালার টু শট, কখনো আবার কেবল বঙ্গবালার ক্লোজ আপ। বাংলা মায়ের প্রতিতুলনাটা তখন বিমূর্ত থেকে পুরোপুরিই মূর্ত হয়ে ওঠে সিনেমার পর্দায়। প্রতীকের সূক্ষ্মতাকে ছাপিয়ে এই প্রতিতুলনা হয়ে ওঠে খুবই সরাসরি ও প্রত্যক্ষ।

প্রশ্ন ৯ - আপনি জানেন ঋত্বিক ঘটক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও শংকরের 'কত অজানারে' অনেকটা নির্মাণ করেও শেষ করতে পারেননি। ছবি দুটি তৈরী হলে বাংলা সিনেমা কতখানি সমৃদ্ধ হোত বলে আপনি মনে করেন?

তানভীর মোকাম্মেল - দেখুন, যে ছবি তৈরী হয়নি সে ছবির কী রকম প্রভাব পড়ত সেটা বলা কঠিন। বিশেষ করে যে ছবিগুলোর কোনও রাশপ্রিন্টও আমি কখনও দেখিনি। তবে শুধু এ দু'টো নয়, কাহিনীচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র মিলিয়ে এরকম আরো বেশ কয়েকটা ছবি রয়েছে যা ঋত্বিক ঘটক শুরু করেও শেষ করেননি বা করে যেতে পারেননি। সেটা বাংলা সিনেমার এক বড় ক্ষতির কারণ হোল। কারণ ঋত্বিক ঘটক যে উঁচু মাপের শিল্পী,

তাতে ওঁর যে কোনও কাজ, কেবল বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলীর দিক থেকেও বাংলা সিনেমা শিল্পকে সমৃদ্ধ করে চলেছিল। কারণ ঋত্বিক ঘটক ওঁর ছবিতে কেবল বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, চলচ্চিত্রের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী নিয়েও তো নানা রকম নিরীক্ষা করতেন। আর চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে ওঁর এসব নিরীক্ষা কেবল ওঁর নিজের ছবিকে নয়, একটা শিল্পমাধ্যম হিসেবে সামগ্রিকভাবে সিনেমা শিল্পের ভাষা ও নন্দনতত্ত্বকেও আরো অনেক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করেছে। এ ছবিগুলোও হয়তো তা করত।

প্রশ্ন ১০ - ঋত্বিক ঘটক অনেকগুলো প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। আদিবাসীওঁ কা জীবনস্রোত, ওরাওঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ফিয়ার, রঁদেভু, পুরুলিয়ার ছৌ, আমার লেনিন ইত্যাদি ছবিগুলো নির্মাণে ও বিষয়বৈগুণ্যে অসাধারণ। ছবিগুলো শুধু সাধারণ দর্শকের জন্যেই নয়, শিক্ষার্থীদের জন্যেও মূল্যবান। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

তানভীর মোকাম্মেল - আপনি যে ছবিগুলোর কথা বললেন সেগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর 'দুর্বার পদ্মা' নামে ঋত্বিক ঘটক একটা প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছিলেন। এছাড়া শান্তিনিকেতনের ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়েও একটা প্রামাণ্যচিত্র শুরু করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের প্রামাণ্যচিত্রগুলোর বিষয়বৈচিত্র্য ও ওঁর বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী সব সময়ই আমাকে আকর্ষণ করে। এটা দুখজনক যে ঋত্বিক ঘটক জীবনে আরো বেশী প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করলেন না। তা'হলে একালের তরুণেরা ওঁর কাজ থেকে আরো অনেক কিছুই জানতে পারত। তবে প্রামাণ্যচিত্রের মূল বিষয়টাই হচ্ছে নির্মাতার নৈর্ব্যক্তিকতা। ঋত্বিক ঘটকের অতিরিক্ত আবেগময়তা ও পক্ষ অবলম্বনের প্রবণতা ওঁর প্রামাণ্যচিত্রগুলোকে খর্বিত করেছে বলেই আমার মনে হয়।

প্রশ্ন ১১ - শুধু বাংলা চলচ্চিত্রে নয়, ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও ঋত্বিক ঘটক একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রয়াত হবার চার দশক পরেও আমাদের কাছে তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এ নিয়ে আপনি কি কিছু বলবেন?

তানভীর মোকাম্মেল - শুধু বাংলা বা ভারতীয় চলচ্চিত্র কেন, ঋত্বিক ঘটক তো বিশ্ব চলচ্চিত্রেই খুবই পরিচিত ও সম্মানিত এক নাম। আমি অনেক বিদেশীকে চিনি যারা ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, ওঁকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিশ্বের অনেক চলচ্চিত্র উৎসবেই ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে রেট্রোস্পেক্টিভ-সেমিনার এসব হয়েছে। এখনও হয়ে থাকে। আমাদের ভাঙা বাংলার আর্তির এক শিল্পী ঋত্বিক ঘটক তো আজ সারা বিশ্বেরই একজন আলোচিত ও শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্রনির্মাতা।

প্রশ্ন ১২ - ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে ক্যামেরার প্রয়োগও কিছুটা ভিন্ন। এ ব্যাপারে যদি কিছু বলেন।

তানভীর মোকাম্মেল - সিনেমাটোগ্রাফির ব্যাপারে ঋত্বিক ঘটক খুবই মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ওঁর ক্যামেরার ব্যতিক্রমী ব্যবহার ঋত্বিকের ছবিগুলোকে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্যই এনে দিয়েছে। মিড-শট তেমন ব্যবহার করতেন না। প্রকৃতি বা নগরজীবনকে পেছনে রেখে চরিত্রদের লং শট বেশী নিয়েছেন। অথবা শট নিয়েছেন ক্লোজআপে। কখনও কখনও বিগ ক্লোজ আপে। তমেঘে ঢাকা তারাদ-য় নীতার অসামান্য সব ক্লোজ আপগুলোর কথা স্মরণ করুন! ক্লোজ আপের এরকম নান্দনিক ও নাটকীয় ব্যবহার ঋত্বিকের সব ছবিতেই কম বেশী রয়েছে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে লেন্সিং। ঋত্বিক ঘটক ওঁর ছবিগুলোতে প্রচুর, বলব সুপ্রচুর, ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার করেছেন। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঋত্বিক প্রায় আলাদা একটা ঘরানাই সৃষ্টি করে গেছেন। ভারতবর্ষের আর কোনও চলচ্চিত্র পরিচালক ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের এত বেশী ও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর যেভাবে উনি এক বিকৃত সময় ও বিকৃত সমাজে ওঁর চরিত্রদের অবস্থান ও তাদের আবেগ-অনুভূতিকে ধরতে চেয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহারটা খুবই কার্যকর হয়েছে। বলতে পারেন, সিনেমাটোগ্রাফিতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের আলাদা একটা নন্দনতত্ত্বই যেন ঋত্বিক ঘটক ওঁর ছবিগুলোতে সৃষ্টি করে গেছেন।

এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যবহার সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা বলি। এটা আমাকে বলেছিলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম। 'তিতাস'-য়ে একটা বৃষ্টির দৃশ্য আছে। বেবী ভাই তো একটা ৫০ মিমি লেন্স লাগিয়েছেন যাতে বৃষ্টির দৃশ্যটা বেশ নান্দনিক লাগে। ঋত্বিক ঘটক ওঁকে বললেন; 'হটাও ওই লেন্স। আমি ওরকম পুতু পুতু সুন্দর বৃষ্টি চাই না। ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লাগাও।' এদিকে বেবী ভাই, যিনিও বেশ অভিজ্ঞ একজন ক্যামেরাম্যান এবং নানা ছবিতে প্রচুর বৃষ্টির দৃশ্য শুট করেছেন, কিন্তু কোনো দিনই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে বৃষ্টির কোনও শট নেননি। তাই কিছুটা অবাকই হয়েছিলেন। কিন্তু শটটা নেবার পর বুঝলেন ঋত্বিক ঘটক আসলে ওঁকে কী শেখাতে চেয়েছিলেন? কারণ পরে রাশ প্রিন্টে দেখলেন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে যেন প্রায় একেকটা টাকার মত বড় বড়! ফলে ছবিটাতে গোটা বৃষ্টির দৃশ্যটাই একটা আলাদা নাটকীয় মাত্রা পেয়ে যায়।

আরেকটা কথাও আমাকে বেবী ভাই বলেছেন, এবং আমি অন্য উৎস থেকেও সেটা জেনেছি যে, ঋত্বিক ঘটক লেন্সের সামনে কোনও ফিল্টার লাগানো মোটেই পছন্দ করতেন না। বেবী ভাইকে বলতেন; 'খবরদার, কাঁচ লাগাবি না।' কাঁচ বা ফিল্টার ছাড়াই ওর শটগুলো নেওয়া হোত। ফলে ওর সিনেমাটোগ্রাফি হয়েছে মানুষটার মতোই স্বচ্ছ, তীক্ষ্ম ও অকৃত্রিম।

প্রশ্ন ১৩ - পাশাপাশি ঋত্বিকের ছবিতে সঙ্গীতের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। বিভিন্ন ছবিতে তিনি যেভাবে গানের প্রয়োগ করেছেন সেটা অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। কোনও কোনও ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার দারুণভাবে ইঙ্গিতবহ। এ সম্পর্কে আপনার মত কি?

তানভীর মোকাম্মেল - ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটা ছবিই সঙ্গীত প্রয়োগ ও আবহসঙ্গীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সমৃদ্ধ। ঋত্বিকের সাঙ্গীতিক জ্ঞান ছিল খুবই উঁচু মাপের। ছবির পর ছবিতে উনি ভারতীয় ধ্রুপদ বা মার্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীভিত্তিক নানা গান, সঙ্গীতাংশ বা সুর, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বাংলা লোকজ গানের খুবই কার্যকর ও নান্দনিক সব ব্যবহার করেছেন। আর গান ছাড়াও সাউন্ডট্রাকে ওঁর মিউজিকের ব্যবহারও তো খুবই সমৃদ্ধ এবং সূক্ষ্ম সব অনুভূতির জন্ম দেয়।

তবে কেবল সঙ্গীত ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নয়, যাকে আমরা বলি এফেক্ট সাউন্ড, মানে ছবির ঘটনা ও চরিত্রদের মেজাজ অনুযায়ী ফলি শিল্পীরা যেসব সাউন্ড এফেক্ট সৃষ্টি করেন, সাউন্ডট্রাকে সেসব শব্দের সৃজনশীল ব্যবহারেও ঋত্বিক ঘটকের কাজ খুবই উঁচু মানের। আসলে ওঁর অনেক ছবির সাউন্ডট্রাকই যেন একেকটা সাউন্ডট্রাকের টেক্সট ফিল্ম যা চলচ্চিত্রের ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো যেতে পারে। আর আমরা তা পড়াইও। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটা থেকে এ দু'টো উদাহরণ তো ঋত্বিক আলোচনায় প্রায়ই আসে। একটা হচ্ছে নীতা যখন বুঝতে পারল ওর প্রেমিক, যাকে নিয়ে ওর অনেক স্বপ্ন ছিল, ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন সব হারিয়ে এক দুসহ যন্ত্রণা নিয়ে নীতা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। এ সময়ে সাউন্ডট্রাকে আমরা শুনি চাবুকের সপাং সপাং শব্দ ভেসে আসে। কেউ যেন নীতার ভেঙে যাওয়া হৃদয়কেই নিষ্ঠুরভাবে চাবুক মারছে। সাউন্ডট্রাকে এফেক্ট সাউন্ডের এ ব্যবহারটা বেশ নাটকীয় ও কার্যকর হয়েছে। তবে ওই 'মেঘে ঢাকা তারা'-তেই আরেকটা এফেক্ট সাউন্ড রয়েছে যা আমার কাছে আরো শিল্পসার্থক মনে হয়েছে। দৃশ্যটা হচ্ছে উঠোনে মা ভাত বাঁধছেন। আমরা জানি, নীতা হচ্ছে এই দরিদ্র উদ্বাস্তু পরিবারটার একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। পেছনে বারান্দায় নীতা আর ওর প্রেমিক গল্প করছে। মায়ের আশঙ্কা ওরা তো প্রেম করছে, তার মানে বিয়ে করে মেয়েটা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। তার মানে এ বাড়ীতে আর হাঁড়ি চড়বে না! মায়ের মনের টেনশনটা বোঝাতে হাঁড়িতে ভাত ফোটার বলকের যে শব্দ হয় খুবই প্রতীকীভাবে ঋত্বিক ঘটক সে শব্দটাকে সাউন্ডট্রাকের ফীডারটা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কর্ণগ্রাহ্য করে তুললেন। ভাতের বলকের একটা শব্দ তো ওঁকে দিতেই হোত। কিন্তু সাউন্ডট্রাকে অতিরিক্ত জোরে সেই শব্দটা দেবার উদ্দেশ্যটাই ছিল মায়ের মনের অস্থিরতার বিষয়টা দর্শকদেরকে বোঝানো। সাউন্ডট্রাকে এফেক্ট সাউন্ডের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা খুবই চমৎকার একটা উদাহরণ। অনেক বেশী অর্থবহও। কারণ এফেক্ট সাউন্ড আপনি যেখান থেকে খুশী এনে সাউন্ডট্রাকে লাগাতে পারেন, যেমন ঋত্বিক চাবুকের শব্দটা বাইরে থেকে এনে লাগিয়েছিলেন। সে স্বাধীনতা একজন চলচ্চিত্রনির্মাতার অবশ্যই রয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে কৃত্রিমতার একটা অভিযোগ আসতেই পারে। তাই সেই এফেক্ট সাউন্ডই বেশী ভালো যেটা পরিপার্শ্বের মধ্যে আছে বা দর্শকের দৃষ্টির মধ্যে আছে। হাঁড়িতে ভাত ফোটানোটা তো আমরা চোখের সামনেই দেখছি। ফলে সেটার শব্দ সুকৌশলে বাড়িয়ে দেওয়াটা ঋত্বিকের সৃজনশীলতারই এক উদাহরণ। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ ঋত্বিক ঘটকের প্রায় সব ছবিতেই ছড়িয়ে রয়েছে নানাভাবে।

প্রশ্ন ১৪ - ঋত্বিক ঘটকের লেখালিখির মধ্যে এক ধরণের রাগ ও ক্ষোভের বহিপ্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই ক্রোধের পাশাপাশি ওঁর লেখালিখিতে এক ধরণের আবেগধর্মিতার প্রকাশও আমরা লক্ষ্য করেছি। এই ক্রোধ কিংবা আবেগ কি সেই অর্থে কাজ করে খুব ছোট জায়গায়? এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

তানভীর মোকাম্মেল - খুবই আবেগময় একজন মানুষ ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। বয়সে না হলেও চেতনায় তো একজন 'রাগী তরুণ'-ই ছিলেন সারাটা জীবন। ১৯৪৭-র বাংলা ভাগ ওঁর মনোজগতের স্থৈর্য্যটাকে ভেঙে একেবারে তচনচ করে দিয়েছিল। কখনোই মানতে পারেননি এই অন্যায় দেশভাগ। দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তুদের আমানবিক দুখ-কষ্ট, নিজের ও পরিপার্শ্বের মানুষদের দারিদ্র্য, শোষণমূলক এক জঘন্য সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, ওঁকে আজীবনই রাগী ও তাড়িত করে রেখেছিল। সুখী হতে দেয়নি। ওঁর লেখালিখি, চলচ্চিত্রনির্মাণ, সব শিল্পকর্মেই আমরা সেই মহৎ রাগের প্রকাশটা দেখি। অনেকটা ওই নজরুলের কবিতার মতোই অদেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছিদ-র মতোই! অ্যালকোহলের মাঝে হয়তো কিছুটা শান্তি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা যে পাননি সেটা তো ওঁর গোটা জীবনটাই প্রমাণ। ঋত্বিকের প্রায় সব ছবিতেই এই রাগ ও তীব্র আবেগময়তার প্রকাশ কমবেশী আমরা দেখেছি। তবে ওঁর ক্ষোভের প্রকাশটা সবচে বেশী রয়েছে ওঁর প্রায় আত্মজৈবনিক ছবি অযুক্তি-তক্কো-গপ্পোদ-তে। ছবিটার শেষ দৃশ্যটা মনে পড়ে? যখন নীলকণ্ঠরূপী ঋত্বিক ঘটক এগিয়ে এসে ক্যামেরার লেন্সে মদ ঢেলে দিলেন। এ যেন আজীবন আবেগী ও রাগী একটা জীবনের খুবই প্রতীকী এক সিনেমাটিক পরিসমাপ্তি!

প্রশ্ন ১৫ - ঋত্বিক ঘটকের ছবি থেকে এই প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের শিক্ষণীয় কি কি? তিনি কি সেই অর্থে তচলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রকারদ না কী অন্য কিছু? আজকের দর্শকেরা ঋত্বিক ঘটকের ছবি থেকে কতখানি লাভবান হতে পারেন?

তানভীর মোকাম্মেল - সিনেমা প্রযুক্তিগত একটা মাধ্যম এবং সে প্রযুক্তিরও দ্রুত ও অতি দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, সব সময়ই এক প্রজন্মের মানুষদের কাছে আগের প্রজন্মের ফিল্মমেকারদের কাজকে, কিছুটা Dated বা 'সময়চিহ্নিত' মনে হতে পারে। হয়ও। তারপরও সব ভালো সিনেমার কিছু শাশ্বত দিক তো থাকেই। ঋত্বিক এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন দেশভাগের পরে উদ্বাস্তুদের বিপর্যস্ত জীবন;'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা', যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক;'অযান্ত্রিক', নক্সাল আন্দোলন;'যুক্তি তক্কো গপ্পো', আর ওঁর প্রায় সব ছবিতে মানুষের আত্মিক উদ্বেগের যে প্রকাশ রয়েছে, এবং যেভাবে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষদের বেদনা ও সঙ্কটকে উনি একটা মহাজাগতিক (Cosmic) আস্তিত্বিক সংকটে পরিণত করেছেন 'উদ্বাস্তু, কে নয়?' তা ঋত্বিক ঘটকের ছবিকে শিল্পের এমন এক গভীরতর স্তরে নিয়ে গেছে যে ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সচেতন দর্শকদের দেখে যেতেই হবে। আমি 'সচেতন' শব্দটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করলাম। কারণ সব ধরণের দর্শকদের ঋত্বিকের ছবি হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে। তবে আগামী দিনের মানুষদেরও এসব আস্তিত্বিক সঙ্কট থাকবে। তাছাড়া বাঙ্গালী জাতির কাছে দেশভাগের তাৎপর্য তো কখনোই ফুরিয়ে যাবে না। তাই ঋত্বিক শুধু 'চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রকার' এরকমটা বললে ওঁর কাজের শিল্পমূল্যকে কিছুটা খর্বিতই করা হয়। আগামী দিনের চলচ্চিকাররা নিশ্চয়ই ওঁর কাজ থেকে অনেক কিছু শিখবেন, তবে এ দেশের মানুষ যত শিক্ষিত ও সচেতন হবে, ইতিহাসসচেতন হবে, হবে ইমেজ-সাক্ষর, ঋত্বিকের ছবির আকর্ষণ ততই বাড়তে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর পরিশেষে বলব যে ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে চলচ্চিত্রনির্মাতারা যুগে যুগে এটাও শিখতে পারেন যে সিনেমা একটা অত্যন্ত সীরিয়াস শিল্পমাধ্যম এবং একশ ভাগ সৎ ও আন্তরিকভাবে স্বদেশ ও মানুষকে ধারণ করে কোনও ছবি তৈরী করলে তবেই সে ছবির ভবিষ্যতে টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে। ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলোর মতো। অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন ১৬ - বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে এবং তার নির্মাণ মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী, ঋত্বিক ঘটকের ছবি থেকে তাঁরা কোনও ভাবনাগত বা প্রকরণগত শিক্ষা নিতে পারে কি? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, বা কী কী সেই শিক্ষা?

তানভীর মোকাম্মেল - বাংলাদেশে আমরা বিকল্পধারার নির্মাতারা মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের ৩৫ মিমি-য়ের বদলে ১৬ মিমি-য়ে আমাদের ছবিগুলো করেছিলাম, বা বর্তমানে ডিজিটালে করছি, এবং সিনেমাহলের বাইরে যেভাবে আমাদের ছবিগুলো প্রদর্শন করে থাকি সেসব ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে হয়তো আমাদের সরাসরি নেবার তেমন কিছু নেই। কারণ উনি মূলধারার প্রতিষ্ঠিত ফর্মাট ৩৫ মিমি-য়েই ওঁর ছবিগুলো করেছেন এবং সেসব ছবি দেখাতেও চেষ্টা করেছেন চলচ্চিত্রের মূলধারার সিনেমা হলের প্রাতিষ্ঠানিক সিস্টেমে।

তবে ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে যে জিনিষটা বিকল্পধারার নির্মাতারা অবশ্যই শিখতে পারেন তা হচ্ছে যে কোনো ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে শত ভাগ আন্তরিক ও সৎ থাকা, কোনো রকম বাণিজ্যিক বিবেচনা মাথায় না রেখে ছবি তৈরী করা এবং ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে দুসাহসী হওয়া। একমাত্র ঋত্বিক ঘটকের পক্ষেই সম্ভব ছিল তঅযান্ত্রিকদ-য়ের মতো অপ্রথাগত একটা বিষয় নিয়ে ওরকম একটা ছবি তৈরী করা কিম্বা অযুক্তি তক্কো গপ্পোদ-র মত অমন প্রত্যক্ষ প্রকাশের একটা ছবি তৈরী করা। তাছাড়া ভিন্নধর্মী নানারকম বিষয় নিয়ে ছবি করার বিষয়টাও ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে বিকল্পধারার নির্মাতারা শিখতে পারেন। এছাড়া ঋত্বিক ঘটক যেভাবে ইমেজে ও সাউন্ডট্রাকে বাংলার নিজস্ব কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক ও সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যসমূহকে তুলে ধরেছেন তা থেকে তো সবারই অনেক কিছুই শেখার রয়েছে। শেখার রয়েছে আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ওঁর সুগভীর আগ্রহের বিষয়টা থেকেও। আরেকটা বিষয়ের কথা বলব। এ যুগে সিনেমা শিল্প বড় বেশী হলিউড প্রভাবিত। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক এমন একজন ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্রকার যাঁর ছবি দেখে মনে হয় হলিউড বলে যেন কোনো দিনই কিছু ছিল না! ওঁর শট টেকিং, অভিনয়ের অতিনাটকীয়তা, চরিত্রদের সংলাপ বলার ধরণ, সবই হলিউড ধারার বিপরীত মেরুতে ও একেবারেই আলাদা। কীভাবে একজন মৌলিক চলচ্চিত্রনির্মাতা হয়ে উঠতে হয়, এ বিষয়টাও ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে এদেশের স্বাধীন ও বিকল্পধারার নির্মাতারা শিখতে পারেন। আরেকটা বিষয়ও শেখার রয়েছে। তা হচ্ছে শিল্পকে বহুস্তরীয় করার ক্ষেত্রে মীথ বা পুরাণের নানা রকম সৃজনশীল ব্যবহার। যেভাবে ঋত্বিক ঘটক বাঙ্গালী সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন ও চরিত্রদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ও বাংলার লোকজ মীথগুলোকে মিলিয়েছেন, তা থেকে সব যুগের শিল্পসচেতন ও বিকল্পধারার নির্মাতারাই অনেক কিছু শিখতে পারেন।

প্রশ্ন ১৭ - ঋত্বিক ঘটকের মতো পরিচালকের সঙ্গে বাঙ্গালী বোহেমিয়ানিজমকে সমার্থক করে থাকে। এই পরিচয় তাঁর শিল্পী বা চলচ্চিত্রকার সত্তার যথার্থ মূল্যায়ন কি? সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যেমন চলচ্চিত্রনির্মাণ শিল্পের meticulousness, method-য়ের প্রতি মনোযোগ ইত্যাদির প্রবল এক সংযোগ আছে। পরিচালককে কি হয় চূড়ান্ত মেথডিক্যাল, নয় বাঁধনছাড়া বোহেমিয়ান হতেই হবে? এতে কি চলচ্চিত্রনির্মাণ প্রক্রিয়ায় আলাদা কোনও মাত্রা যোগ হয়?

তানভীর মোকাম্মেল - সব যুগেই দু'রকম শিল্পী থাকেন। এক ধরনের শিল্পী হন যাঁরা বিশুদ্ধতাবাদী, কাজে খুব মেথডিক্যাল। অনেকটা ক্লাসিকধর্মী। আরেক ধরণের শিল্পী হন রেবেল বা এস্টাব্লিশমেন্টবিরোধী যারা প্রচলিত নর্মগুলো ভাঙতে চান।

বাংলা সিনেমায় সত্যজিৎ রায় যদি হয়ে থাকেন প্রথম ধারার, ঋত্বিক ঘটক নিসন্দেহে দ্বিতীয় ধারার একজন শিল্পী। ঋত্বিকের মধ্যে একটা চরম প্রতিষ্ঠানবিরোধী ঝোঁক ছিল এবং এস্টাব্লিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করতে উনি অনেক দূরই যেতে প্রস্তুত ছিলেন। বাংলা সিনেমার প্রচলিত নর্মগুলো ঋত্বিক ঘটক অনেকভাবে এবং অনেকবারই ভেঙেছেন। ওঁর নিজের মতো করে নতুন নর্মও সৃষ্টি করেছেন। যেমন প্রথার বাইরে গিয়েই ওঁর ছবিগুলোতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সের ব্যাপক ব্যবহার বা সাউন্ডট্রাকে এফেক্ট সাউন্ড নিয়ে নানা রকম সাহসী নিরীক্ষা। ব্যক্তিজীবনে ঋত্বিক হয়তো ছিলেন পুরোপুরিই বোহেমিয়ান। তবে যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তখন কিন্তু যথেষ্টই গোছালো ও যত্নবান ছিলেন। ওঁর খুব কম ছবির শরীরেই ওঁর ব্যক্তিজীবনের অগোছালো দিকটার ছাপ রয়েছে। কেবলমাত্র অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের ফলে যখন শেষের দিকে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনই কেবল ওঁর দু'একটা ছবিতে এই শিল্প-শৃঙ্খলার অভাবটা চোখে পড়ে। বাঙ্গালী যে ঋত্বিক ঘটক আর বোহেমিয়ানিজমকে এক করে দেখে থাকে সেটা হয়তো খুব একটা ভুল নয়। তবে সেটা ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে হয়তো সত্য। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক আর দশজন শিল্পসচেতন চলচ্চিত্রকারের মতই ছিলেন দায়িত্বশীল।

প্রশ্ন ১৮ - দেশভাগ সাহিত্য বা পার্টিশন লিটারেচার এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যে পাঠক্রমের অঙ্গ। ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলো কি টেক্সট হিসেবে এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে? আপনার অভিমত কী?

তানভীর মোকাম্মেল - অবশ্যই হতে পারে। এবং সেটা হয়েছেও। একাডেমিক মহলে দেশভাগ-বিষয়ক যে কোনও আলোচনায় ঋত্বিকের ছবিগুলোকে মূল্য দেওয়া হয়। সরাসরি হয়তো দেশভাগ নয়, তবে ঋত্বিকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' এই তিনটে ছবিতে দেশভাগ-উত্তর পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের জীবন-সঙ্কট এত গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে দেশভাগের চলচ্চিত্র নিয়ে যে কোনো মননশীল আলোচনা এ ছবিগুলো বাদ দিয়ে করাটা কঠিন। আসলে ঋত্বিকের মতো আর কোনও ভারতীয় পরিচালক তো দেশভাগ নিয়ে এতটা তাড়িত ছিলেন না। দেশভাগের আলোচনায় তাই ঋত্বিকের ছবিগুলো বারবারই ফিরে আসে। আমার বিশ্বাস আগামীতেও আসবে।

প্রশ্ন ১৯ - একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে আপনি কতখানি ঋণী ঋত্বিক ঘটকের কাছে? ওঁর ছবি নিয়ে আলোচনা করতে আপনি কেন আগ্রহবোধ করেন? অগ্রপথিক হিসেবে আপনার পথ চলায় আপনি ওঁকে কোন্ মর্যাদায় ভূষিত করতে চান? এবং কেন?

তানভীর মোকাম্মেল - ঋত্বিক ঘটকের ছবি দেখে বড় হয়েছি। ফিল্ম সোসাইটি করবার দিনগুলোতে ঋত্বিকের ছবি নিয়ে মননশীল চর্চা করেছি। আমার মনে হয় না কোনো বাঙ্গালী ফিল্মমেকারই ঋত্বিক ঘটককে এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে তার চলচ্চিত্র জীবন গড়তে পারবেন। একটা ক্ষেত্রে ঋত্বিকের কাজের সঙ্গে আমার কাজের হয়তো কিছু মিল রয়েছে। তা হচ্ছে আমরা দু'জনেই দেশভাগ নিয়ে বেশ কয়েকটা ছবি তৈরী করেছি। এটা ঠিক প্রভাব বা ঋণের ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে কোনো বিশেষ বিষয়ের উপর দুই প্রজন্মের দু'জন শিল্পীর সমআগ্রহ। ঋত্বিকের মতো দেশভাগ আমাকেও গভীরভাবে ব্যথিত করে। তবে ঋত্বিক যেখানে দেশভাগ-উত্তর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া উদ্বাস্তুদের দুখ-বেদনাকে দেখিয়েছেন, আমার ছবিগুলোতে মূলত এসেছে এসব পরিবারের পূর্ববঙ্গের জীবন এবং দেশত্যাগের ঘটনা ও কার্যকরণ। তবে ঋত্বিক ঘটক খুবই উঁচু মাপের একজন শিল্পী। আমার সামান্য কাজকে ওঁর কাজের সঙ্গে তুলনা করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমার ছবিগুলো খুবই স্বল্প বাজেটে ও স্বল্প আয়োজনে তৈরী।

তবে ঋত্বিক ঘটকের কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি যে একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে আমাকে কী কী এড়িয়ে চলতে হবে। আমি মদ্যপান করি না এবং বোহেমিয়ান জীবন যাপনও করি না। কারণ ঋত্বিকের জীবনের করুণ পরিণতি থেকে আমরা শিখেছি এসব জিনিষ একজন শিল্পী ও তাঁর শিল্পকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে! ঋত্বিক যদি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতেন, ওরকম অ্যালকোহল-আসক্তি ওঁর যদি না থাকত, তাহলে বাংলা ও বিশ্ব-চলচ্চিত্র আরো অনেকগুলো অসামান্য চলচ্চিত্র পেতে পারত। তবে ঋত্বিক প্রসঙ্গে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে আমি নিজে আসলে ঠিক কী ধরণের চলচ্চিত্রনির্মাতা হতে চাই, তাহলে বলব, একজন বাঙ্গালী নির্মাতা হিসেবে আমার স্বপ্ন থাকে, যদি ঋত্বিকের Passion আর সত্যজিতের Perfection, এ দু'টো একসঙ্গে পেতে পারতাম! কিন্তু তা কী সম্ভব!?

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ সুশীল সাহা ও শিশির রায়

মোহর

স্বপন কুমার সোম

'ওই কণ্ঠ কাঁপে যেন পদ্মপাতার জলে/ ছড়িয়ে যায় ছোট ছোট মুক্তোদানা/ কখনো ভোরের কখনো সন্ধের আবছা আলোয়/... রবীন্দ্রনাথের শব্দমালা / আমাদের স্নায়ুধমনীতে ঝলকায়/ আমাদের রক্তকণিকারা আলোয় মাতে / ওই কণ্ঠের জাদুকরি-খেলায়।'--- অরুণ মিত্রের এই কবিতায় বলা 'ওই কণ্ঠ' কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কবিতার নামও 'কণিকার গান'। সত্যিই তো, কণিকার কণ্ঠের জাদুকরি-খেলায় রবীন্দ্রনাথের শব্দমালা আমাদের স্নায়ুধমনীতে ঝলকায়। ওই কণ্ঠ 'আকাশসীমায় দোলে', 'আমাদের ঘুম জাগরণ জুড়ে'। রবীন্দ্রনাথের গানের আরেক সার্থক রূপকার কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে জন্ম। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, মা অনিলা দেবী। পাঁচ ভাই, তিন বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কণিকা। খুব ছোটোবেলা মামার বাড়ি বিষ্ণুপুরে কাটলেও কিছুদিনের মধ্যেই বাবার কর্মসূত্রে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। সেখানেই বড় হয়ে ওঠা। বাবা সত্যচরণ কেন্দ্রীয়

গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে যোগ দেন। বাবা, মা দুজনেই ভালো গাইতে পারতেন, বিশেষত মা অনিলা দেবীর কণ্ঠ ছিল অসামান্য। আর তাই বুঝি কণিকার কণ্ঠে অত লাবণ্য, মাধুর্য। ছুটি ছাটার সময়ে পরিবারের সকলেই তাঁদের যে যার কর্মস্থল থেকে বাঁকুড়ায় চলে আসতেন। বাড়ির উঠোনে মাঝে মাঝেই আসর বসত। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি আর অবশ্যই গান হত। গানের মধ্যমণি ছিলেন কণিকা, যদিও তাঁর সব ভাইবোনই গান জানতেন, করতেন। কণিকা গান শুরু করলে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। সকলেই বলাবলি করত, 'আহা, কী গলা'। ওঁদের দাদু কণিকার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে আশীর্বাদ করতেন।

শান্তিনিকেতনই কণিকার ধাত্রীক্ষেত্র। ডাকনাম তাঁর ছিল 'মোহর'। সেই 'মোহর'-এর পোষাকি নাম 'কণিকা' রাখলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পাঠভবন-শিক্ষাভবন পার হয়ে শেষে সংগীতভবন থেকে রবীন্দ্রসংগীত ও উচ্চাঙ্গসংগীত নিয়ে উত্তীর্ণ হন। চিত্র-পরিচালক গৌতম ঘোষ একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন 'মোহর' নামে। সেই তথ্যচিত্রে নিজের সংগীতশিক্ষা বিষয়ে কণিকা জানাচ্ছেন 'হেমেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় আর শেষে ভি ভি ওয়াঝেলওয়ারের কাছে গান শিখেছি। রবীন্দ্রসংগীত শিখেছি স্বয়ং গুরুদেবের কাছ থেকে। তা ছাড়া দিনুদা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বিবিদি (ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী), শান্তিদা (শান্তিদেব ঘোষ), অমিতাদি (অমিতা সেন) সবার কাছেই তো ক্লাস করতাম। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমাকে আলাদা করে নিয়ে আদরে যত্নে যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি শৈলজারঞ্জন মজুমদার।' ঠিকই, রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, শান্তিদেব ঘোষের কাছে শিখলেও কণিকার গায়ন গড়ে দিয়েছিলেন শৈলজারঞ্জন যা রবীন্দ্রনাথ-দিনেন্দ্রনাথ-শান্তিদেব থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রসংগীতের এই কিংবদন্তি শিল্পীর যাত্রা শুরু কিন্তু বাংলা আধুনিক গানে। ১৯৩৮-এ, মাত্র ১৪ বছর বয়সে একটু আকস্মিকভাবেই রেকর্ড করার সুযোগ এল। রবীন্দ্রসংগীত বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষক নীহারবিন্দু সেন সেসময় কিছু আধুনিক গান লিখেছিলেন এবং সুর করেছিলেন। তা কণিকার প্রথম গান দুটির গীতিকার এই নীহারবিন্দুই। সুর দিয়েছিলেন অবশ্য হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হিন্দুস্থান কোম্পানি থেকে কণিকার প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হল 'ওরে ঐ বন্ধ হল দ্বার' ও 'গান নিয়ে মোর খেলা' (এইচ ৫৮৪)। প্রথম রেকর্ড করা নিয়ে কণিকা নিজেই বলছেন 'যখন প্রথম রেকর্ড করলাম তখন গুরুদেব জীবিত। রেকর্ড করতে আমার কী ভয়। তারপর কত যে রেকর্ড করলাম, গাইবার ঢংও কত বদলে গেছে।' এখানে শেষের কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনের দশকের কণিকা আর পাঁচ বা ছয়ের দশকের কণিকার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কণ্ঠস্বর, গায়ন-সব দিক দিয়েই এই বদল। প্রথম সেই রেকর্ডে কিশোরী কণিকার স্বরক্ষেপণ- উচ্চারণ তথা সামগ্রিক গায়ন তৎকালীন ধারা অনুযায়ী যা কিছুটা প্রাচীনগন্ধীই বটে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সুর ছিল বেশ রবীন্দ্র-ঘেঁষা। প্রথম রেকর্ডের মাস কয়েক বাদে ১৯৩৮-এর আগস্টে প্রকাশিত 'ফুলপরী' শিশুনাট্যে (রচনা অখিল নিয়োগী, নাট্য পরিচালনা গোকুল মুখোপাধ্যায়, সুর ও সংগীত পরিচালনা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়) কণিকা গানে অংশ নিলেন মীরা সরকার, ইন্দ্রাণী রায়, সন্ধ্যা সেন, কানাইলাল কর্মকার, গোকুল মুখোপাধ্যায় ও অখিল নিয়োগীর সঙ্গে। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ একটু দুঃখই পেয়েছিলেন, কণিকা তাঁর গান রেকর্ড না করায়। অবশ্য কণিকার রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডের ব্যবস্থা তিনিই করলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে বেরল কণিকার প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে' ও 'ডাকব না ডাকব না' (এইচ ৬৪৮)। সে-মাসের রেকর্ড-ক্যাটালগে রেকর্ডটির পরিচিতি দেওয়া হল এইভাবে 'কুমারী কণিকা মুখার্জির প্রথম রেকর্ডখানি সকলের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে। এবার তাহার আর একখানি রেকর্ড বাহির হইল। এই গান দুখানি শুনিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিবেন।' রেকর্ডের লেবেলে শিল্পীর নাম লেখা হল কণিকা মুখার্জি (মোহর)। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এখানে রবীন্দ্রসংগীত না লিখে বলা হল 'বেঙ্গলি সঙ', কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ। তার পরও বছর দশেক কণিকার রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডে নয় 'বেঙ্গলি সঙ', নয়তো 'বেঙ্গলি মর্ডান' লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতের দ্বিতীয় রেকর্ড ১৯৩৯-এর অক্টোবরে 'ওই মালতীলতা দোলে' ও 'ঘরেতে ভ্রমর এল'। এই রেকর্ড বিষয়ে রেকর্ড-ক্যাটালগে এল শান্তিনিকেতন ও প্রশিক্ষকের কথা 'কুমারী কণিকা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় কণিকাকে এই দুইখানি গান রেকর্ড করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন।' তৃতীয় রেকর্ডও হিন্দুস্থান-এ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারেরই পরিচালনায় বর্ষা প্রকৃতির 'এসো শ্যামলসুন্দর' ও 'ওগো তুমি পঞ্চদশী' ১৯৪২ সালের মে মাসে। কণিকার হিন্দুস্থান পর্ব এখানেই শেষ। ১৯৪২-এরই অগাস্টে এইচ এম ভি থেকে তাঁর প্রথম রেকর্ড, 'রিমিকি ঝিমিকি ঝরে' ও 'শ্রাবণের গগনের গায়' (এন ২৭৩০৭)। এর পর সব রেকর্ডই এইচ এম ভি-তে। ১৯৫০-এর 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' বা 'যদি তারে নাই চিনি গো' পর্যন্ত কণিকার নিজেকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলতে থাকে বিভিন্ন বছরে বেরনো 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে' (১৯৪৩), 'আজি দক্ষিণ পবনে' (১৯৪৪), 'বলো সখী বলো তারি নাম' (১৯৪৫), 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে' (১৯৪৮) বা 'শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা' (১৯৪৯)---রেকর্ডগুলির মধ্য দিয়ে। এখানে উল্লেখ্য, যে-মুক্তছন্দের টপ্পাঙ্গের গানের জন্য কণিকার সুবিপুল খ্যাতি তা প্রথম পাওয়া গেল ১৯৫০-এ, 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব নাক্ষ্ম। এই গানে সুরময় স্বকীয়তার যে-ক্ষেত্র প্রস্তুত হল, দু-বছর

বাদে 'নীলদিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল'তে তাই যেন পূর্ণতা পেল। তাঁর গায়ন এখন অনেক নির্ভার, ঋজু আর এক অপরূপ লাবণ্যে ভরা। এই কণিকা- কে একেবারেই মেলানো যাবে না 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে'-র (প্রথম রেকর্ড) কণিকার সঙ্গে। এখানেই বলা দরকার যে, সুচিত্রার ক্ষেত্রে এমনটা হয় নি। ১৯৪৫-এ তাঁর প্রথম রেকর্ডের 'মরণ রে তুঁহু মম'-তে যে-সুচিত্রাকে পেয়েছি, অনেক পরের 'আসা যাওয়ার মাঝখানে'-তেও সেই সুচিত্রাকেই পাচ্ছি, শুধু কালের নিয়মে গলা একটু ভারি হয়েছে, গায়ন প্রায় একই। কণিকা নিজের জায়গাটি অর্জন করে নেবার পর 'বিমল আনন্দে জাগো' (১৯৫৩), 'আরো আঘাত' (১৯৫৪), 'আমার মিলন লাগি' (১৯৫৫), 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' (১৯৫৬), 'আজ জ্যোৎস্নারাতে' (১৯৫৮), 'বেদনা কি ভাষায় রে' (১৯৫৯), 'পথ চেয়ে যে' (১৯৬০) বা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে 'বাজে করুণ সুরে'---এমনতর বহু গানের মধ্য দিয়ে পরিণতির উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছলেন। এই সমস্ত গানের কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলা যায় ! কোনো কোনো গান সম্পর্কে বলাই যায়। কেননা মুক্তছন্দের গানে, টপ্পাঙ্গের গানে কণিকার এক আলাদা সিদ্ধি। নিখুত সুমিত অলংকরণ। উপরে উল্লেখিত 'বাজে করুণ সুরে', 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল' তো বটেই, সে ছাড়া 'তোমায় নতুন করে পাব বলে', ঠুংরি-ভাঙা 'বন্ধু রহো রহো সাথে' (রবীন্দ্রনাথের এই গানে টপ্পারও সামান্য কাজ আছে), 'কিছুই তো হল না', 'সকল জনম ভরে' বা 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'---এমন সব গান সেই সাক্ষ্যই দেবে। অন্য আমেজের, আঙ্গিকের গানেও যে কণিকা সার্থক, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী', 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর', 'ও যে মানে না মানা', 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', 'জননী তোমার করুণ চরণখানি', 'বারতা পেয়েছি মনে মনে', 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল'.. এমন আরও কত গান। তাঁর কণ্ঠে সুরের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য, সেই সঙ্গে লাবণ্য আর একটা শান্ত মগ্নতা। এই নিয়েই তিনি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এইচ এম ভি প্রকাশ করেছে এল পি রেকর্ডে। এইরকম একাধিক প্রযোজনায় কণিকা অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বাগ্রে বলতে হয় রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত 'শ্যামা'র কথা। কণিকা এমন বান্ময় মাধুর্যে শ্যামার গানগুলি কণ্ঠে ধরেছিলেন যে কণিকা ছাড়া যেন ভাবাই যায় না শ্যামার গান। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য 'চিত্রাঙ্গদা' (এইচ এম ভি যখন দ্বিতীয় বার প্রকাশ করে), 'মায়ার খেলা' বা 'তাসের দেশ'। শেষোক্ত দুটির সংগীত পরিচালকও তিনি।

একাধিক চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের গান নেপথ্যে গেয়েছেন। প্রথম 'তথাপি' (১৯৫০)-তে 'স্বপনে দোঁহে ছিনু' ও 'আমি তখন ছিলেম মগন'। সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় 'নিমন্ত্রণ' (১৯৭১)-এ 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' এবং পঙ্কজকুমার মল্লিকের সংগীত পরিচালনায় 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' (১৯৭২)-য় 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। বেসিক ডিস্কে 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' আগেই গেয়েছেন ১৯৫৬-তে। ছবির প্রয়োজনে আবার গাইলেন, এবার যন্ত্রানুষঙ্গ অন্যরকম, অনেক আধুনিক, কিন্তু মাত্রা-ছাড়ানো নয়। এখানেই বলা দরকার, কণিকার গাওয়া 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'-র সঙ্গে স্বরবিতানে মুদ্রিত স্বরলিপির মিল নেই। কণিকা গেয়েছিলেন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণে। তা কণিকার গাওয়া অনুযায়ী একটি স্বরলিপি ভি বালসারা করেন, যা প্রকাশিত হয়েছে স্বরবিতান ৬৪ খন্ডে। রবীন্দ্রনাথের গান মূল জায়গা হলেও অন্য গানও শুনিয়েছেন। তার মধ্যে ভজন ও অতুলপ্রসাদের গান সর্বাধিক। ভজন- 'প্রভু জায় বসে', 'মোরি চুনরি মে' বা 'গোবিন্দ কবহু মিলে গানে মেলে এক সমর্পিতপ্রাণ শিল্পীকে। অতুলপ্রসাদের গানের গভীরে সহজে পৌঁছতে পারেন কণিকা 'ওগো নিঠুর দরদী', 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' বা 'যখন তুমি গাওয়াও গান' পরিবেশনে। একইভাবে মন ছুঁয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হে অন্তর্যামী' এবং ব্রহ্মসংগীত---কাঙাল হরিনাথের 'যদি ডাকার মতো'। কাজী নজরুল ইসলামের 'তোমার মহাবিশ্বে হারায় না তো' উল্লেখযোগ্য।

কণিকার প্রথম রেকর্ডটাই তো ছিল আধুনিকের। পরে সলিল চৌধুরীর কথায়-সুরে 'প্রান্তরের গান আমার' রেকর্ড করলেও শান্তিনিকেতনের চাপে তা বেরোয় নি। সে-গান অতঃপর উৎপলা সেনকে দিয়ে গাইয়েছিলেন সলিল চৌধুরী। উৎপলা সেন খুবই ভালো গেয়েছেন, তাহলেও বলতে হয় কণিকার কণ্ঠের এই গান থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। একটা অন্য রূপে কণিকাকে হয়তো পাওয়া যেত।

কণিকার কর্মজীবন কেটেছে বিশ্বভারতী-তে রবীন্দ্রসংগীতের অধ্যাপিকা হিসেবে।

স্বামী বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে বই লিখেছেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক', 'রবীন্দ্রসঙ্গীত কাব্য ও সুর'। তাছাড়া এককভাবে স্মৃতিকথা 'আনন্দধারা'।

বহু পুরস্কারে ভূষিত সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, দেশিকোত্তম ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন জায়গা ছাড়া বিদেশে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, কানাডা, ইউরোপ, বাংলাদেশে গান শুনিয়ে অগণিত শ্রোতাকে তৃপ্তি দিয়েছেন।

প্রয়াত হলেন ২০০০-এর ৫ এপ্রিল।

লেখক বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক।

নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে জওহরলাল ও কংগ্রেস -কমিউনিস্ট সম্পর্ক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রাশিয়ায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল সে সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু অবহিত ছিলেন। জওহরলাল পিতা মতিলাল নেহরুর সঙ্গে সপরিবারে ১৯২৭ সালে রুশ বিপ্লবের দশম বর্ষ পূর্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখে ফিরে এসে ওই দেশের নতুন জাগরণের কথা, জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ও দেশের মানুষের কাছে বলতে থাকেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ১৯৩০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় ঘুরে এসে তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে বিস্তৃতভাবে ওই দেশে যে নতুন পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

ওই সময় বিভিন্ন সভায় জওহরলাল সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। ব্রিটিশ সংবাদপত্র, এমনকি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও তাকে 'ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট' বা 'প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট' বলে আখ্যা দেওয়া শুরু হয়। নেহেরু কন্যা ইন্দিরার জন্ম ১৯১৭ সালের নভেম্বরে। তিনি আজীবন নভেম্বর বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জীবনাবসানের আগেও তিনি মজা করে বলেছেন, 'নভেম্বর বিপ্লব আর আমি সমবয়স্ক'। ইন্দিরার যখন ১৩ বছর বয়স, সেই সময় জওহরলাল জেলে। নাইনি জেল থেকে জওহরলাল তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে তাঁর জন্মদিনে চিঠিতে লিখেছিলেন ১৯১৭ সাল, যে সালে তোমার জন্ম সেই সময় রাশিয়ায় একজন যুগ প্রবর্তক তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দুঃস্থ এবং দরিদ্রের জন্য তাঁর হৃদয় প্রেমে করুনায় উচ্ছসিত ছিল। ঠিক যে মাসে তোমার জন্ম সেই মাসেই যুগান্তকারী রুশ বিপ্লব ঘটেছিল। তাঁর নেতা ছিলেন লেনিন।

আন্তর্জাতিকতাবাদ ও শ্রমিক আন্দোলন ঃ ১৯২৭ সালে ব্রাসেলস - এ লিগ এগেইনস্ট - ইমপিরিয়ালিজমের সম্মেলনে দেশ বিদেশের অনেক কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গে জওহরলালের সাক্ষাৎ হয়। ওই সম্মেলনে প্রবাসী কমিউনিস্ট বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বোম্বাই-এর শ্রমিক (কমিউনিস্ট) নেতা যোগলেকর উপস্থিত ছিলেন। দেশে ফিরে আসার পর ১৯২৮ সালে ঝরিয়ায় এ আই টি ইউ সি'র সম্মেলনে জওহরলাল ওই সংগঠনের সভাপতি হন। এর পর থেকে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯২০ সালের ৩১শে অক্টোবর এ আই টি ইউ সি র জন্ম। ঐ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয় ভারতের শ্রমিক শ্রেনী শুধু ভারতের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না তারা আন্তর্জাতিক সংহতিরও অংশীদার। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষনের বিরূদ্ধে সংগ্রামী মানুষকে রুশ বিপ্লব অনুপ্রেরনা দেয়। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হয়, শ্রমজীবী মানুষ এবং নিপীড়িত মানুষকে তাদের সংগ্রামে নূতন দিশা দেখায়।

শ্রমিক সংগঠন মডারেটদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংঘাতে জওহরলাল নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর সহানুভূতি কমিউনিস্টদের দিকেই ছিল। একথা তিনি তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফিতে' উল্লেখ করেছেন। তিনি যদিও এই সংঘাতের ফলে ওই সংগঠন ভেঙে যাওয়ায় খুবই হতাশ হয়েছিলেন। তবে ৩০ এর দশকের মাঝামাঝিতে গিয়ে সংগঠন আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় জওহরলাল দৃঢ়তার সঙ্গে কমিউনিস্টদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ও পিতা মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে 'মিরাট ডিফেন্স কমিটি' গঠন করেন। মামলা পরিচালনার প্রভূত সহায়তা করেন। তাঁর অনুরোধে গান্ধিজি মিরাট জেলে এসে কমিউনিস্ট বন্দীদের সঙ্গে - সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানান।এর ফলে দেশের মানুষের মধ্যে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় ও তাঁদের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঃ ৩০ এর দশকের গোড়া থেকে ইউরোপে নাৎসী মতবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান হতে শুরু করে। রোম-বার্লিন-টোকিও অ্যাক্সিস বা অক্ষশক্তি গঠিত হয়। মানবতা ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এই অক্ষশক্তির আক্রমণ পরিচালিত ছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের - সাধারণ সম্পাদক জর্জি দিমিত্রভ এই সময়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। এই তত্ত্বের আলোকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনীপাম দত্ত ও ব্রেন ব্রাডলি কমিনটার্নের কাছে একটি থিসিস পেশ করেন। এই থিসিস 'দত্ত ব্র্যাডলি থিসিস' নামে খ্যাত। তাতে বলা হয় মতপার্থক্যের জন্য বর্তমানে বহুধাবিভক্ত কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেই ঐক্যবদ্ধ পার্টিকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে নিজস্ব অস্তিত্ব ও মতাদর্শ বজায় রেখে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্টরা ১৯৩৩ সালে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গোপন অধিবেশন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেন। পার্টি তখন বে-আইনি। এই ঐক্যবদ্ধ পাটির প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন এস. ডি. ঘাটে। একবছর পর তিনি গ্রেফতার হয়ে গেলে এই

দায়িত্ব গ্রহণ করেন সোমনাথ লাহিড়ি। তিনিও ১৯৩৫ সালে গ্রেফতার হলে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন পুরণ চাঁদ যোশি। তিনি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলালকে গুরুতর অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে যাবার জন্য জেল থেকে প্যারোলে ছাড়া হয় ।তখন কমলা জার্মানির বেডেনওয়েলারে চিকিৎসায় ছিলেন। নেহরু আসার পর তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডের লসানে নিয়ে আসা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ -এ কমলার মৃত্যু হয়। তখন ওখানে নেহরুর সঙ্গে কণ্যা ইন্দিরা ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন ।ওই সময় ওখানে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হ্যারি পলিটের চিকিৎসা চলছিল। তাঁকে দেখতে আসা ওই দেশের দুই কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্ত ও ব্রেন ব্রাডলির সঙ্গে নেহরুর সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে কমিউনিস্টরা যোগ দেবে। কমিনটার্নের এই দুই নেতার সঙ্গে জওহরলালের যে সন্ধি হয় তা কমিনটার্নের ইতিহাসে 'কংগ্রেস-কমিউনিস্ট প্যাক্ট' বলে উল্লেখ করা হয়।

পণ্ডিত নেহরু কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে বলেছিলেন তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থা ও মার্কসবাদী চিন্তার প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করবেন , কিন্তু দেশে স্বাধীনতার পর কোনও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা তিনি চান না। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন তাঁদের লক্ষ।

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল সভাপতি ছিলেন। অধিবেশনের প্রস্তুতিপর্বে তাঁর সঙ্গে পি. সি. যোশির দীর্ঘ সাক্ষাৎ হয়। যোশি তাঁকে বলেন অধিবেশনে কমিউনিস্টরা কৃষাণ সভা গঠন ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলা কংগ্রেস কর্মীদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এই মর্মে প্রস্তাব আনতে চান। তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানান। জওহরলাল যোশিকে বলেন যে তিনি তাঁর বক্তব্য গান্ধিজি ও সর্দার প্যাটলকেও বলুন। তিনি অবশ্যই যোশির প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। যোশি সেই মোতাবেক গান্ধিজি ও প্যাটেলের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধিজি যোশিকে বলেছিলেন তিনি কমিউনিস্টদের সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করেন, তিনি তাঁদের আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না। কিন্তু সর্দার প্যাটেল যোশিকে বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের মঞ্চকে শ্রেণী সংগ্রামের বিষ ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করার কমিউনিস্টদের এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করবেন। যাইহোক জওহরলালের সমর্থনে কৃষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার জন্য কমিউনিস্টদের আনীত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ শুরু করায় কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সারা ভারত কৃষাণ সভা ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কমিউনিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলন ঃ ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ১৯৪১-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হলে কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 'জনযুদ্ধে' পরিণত য়ছে বলে ঘোষণা করে। পার্টির বক্তব্য ছিল এই পরিস্থিতিতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেন মিত্রশক্তির অংশীদার, তখন কোনও ব্রিটিশ বিরোধী চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেওয়া উচিত হবে না। পার্টি আগস্ট প্রস্তাবের (৮ আগস্ট, ১৯৪২ মধ্যরাতে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ আনীত) বিরুদ্ধে ভোট দেয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভোররাতে গ্রেফতার হয়ে যান। কমিউনিস্টরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। পার্টি আইনসিদ্ধ হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্কের অবনমন হয়। রক্ষণশীল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও বিশেষ করে সোসালিস্টরা তীব্র কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার ও আক্রমণ চালাতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ দেয় ফরোয়ার্ড ব্লক।

১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব, সমর্থন করে। পার্টি মনে করেছিল মুসলমানরা পশ্চাদপদ, দরিদ্র, সংখ্যালঘু ও নিপীড়িত। পার্টি ব্যাখ্যা দেয় 'পাকিস্তান' দাবি মুসলিম জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের তীব্র আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ। পার্টি লেনিনের নিপীড়িত জাতিসমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংক্রান্ত থিসিসের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল 'Free Islam in free India.'

১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি জাতীয় নেতৃবৃন্দ জেল থেকে ছাড়া পান। জওহরলাল কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন। কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যান্ড ওয়াগনে তিনি কখনোই যোগ দেননি। পার্টির পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী ও সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা জেড. এ. আহমেদ। তিনি পার্টিতে একটি নোট দিয়ে জওহরলালের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ দেন। জওহরলাল তাঁকে বলেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধীতা প্রশমিত করার জন্য তিনি অবশ্যই চেষ্টা। করবেন। কিন্তু আহমেদ যখন তাঁকে 'পাকিস্তান' প্রশ্নটি বিবেচনা করতে বলেন তখন জওহরলাল বলেছিলেন এই দাবি 'দ্বিজাতিতত্ত্বে'র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সাম্প্রদায়িক দাবি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে এটি দ্রুত অনুধাবন করার জন্যে বলেন। তিনি রজনী পাম দত্তকেও ভারতের কমিউনিস্টদের এই রাজনৈতিক ভুল সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

১৯৪৭ স্বাধীনতা ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন উপমহাদেশ জুড়েই অস্থির পরিস্থিতি। একদিকে একটি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। এই দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির ভালোরকম প্রাদুর্ভাব হয়েছে। কাশ্মীরে উপজাতীয় হানাদারদের আক্রমণ, যা ছিল কাশ্মীরের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি যে সংগ্রাম মহারাজা হরি সিংহের বিরুদ্ধে করছিল, তার বিরুদ্ধে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির অভিযান। ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অবশেষে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা মহাত্মা গান্ধির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদ নতুন সংবিধান গ্রহণ করে। ভিত্তি হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কংগ্রেস দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী শক্তিও অতীব সক্রিয় ছিল। জওহরলালের নেতৃত্বকে দুর্বল করার প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। এই সময়ে বামপন্থীদের উচিৎ ছিল দৃঢ়তার সঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে মতাদর্শগত প্রচার ও সংগ্রাম চালানো। প্রথমে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, জয় প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া প্রমুখ সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে সোসালিস্ট পার্টি গঠন করেন। তাদের ক্রোধ ও ক্ষোভ ছিল প্যাটেলের বিরুদ্ধে। প্রায় একই কারণে দল ছেড়ে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি গঠন করেন আচার্য কৃপালনি, ড. প্রফুল্ল ঘোষ, ডা.সুরেশ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস ত্যাগ না করার জন্য পন্ডিত নেহরুর বারংবার অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করেননি।

কিন্তু নেহরুর পক্ষে সবচাইতে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮-এ অনুষ্ঠিত) স্বাধীনতাকে 'মিথ্যা' বলে ঘোষণা করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে উচ্ছেদের ডাক দেওয়া হয়। এই নিয়ে বিস্তৃত আলাচনার সুযোগ এখানে নেই। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় ১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে এই রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সংবাদে প্রধানমন্ত্রী নেহরুষ্ট খুবই বিরক্তবোধ করেন। আই সি. এস অশোক মিত্র তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রধানমন্ত্রী ১এপ্রিল তারিখে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে লেখেন, তআপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করেছে। এই আদেশ জারির আগে আমাদের আদৌ জানানো হয়নি। এই ধরনের এক তরফা নীতি স্বভাবতই অনুচিত, কারণ কোন যুক্তরাষ্ট্রে কোন বিশেষ প্রদেশের আদেশের ঘাতপ্রতিঘাত সেই প্রদেশেই আবদ্ধ থাকে না। তার প্রতিক্রিয়া অন্য রাজ্যে হতে বাধ্য। সুতরাং এ ধরনের সবকিছু প্রথমেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে তবে করা উচিত। (আমাদের দিক থেকে) কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা, অথবা ব্যাপক ধরপাকড় করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। আশা করি এ কথাটি আপনার সরকার ভবিষ্যতে মনে রাখবে এবং শুধু তাদেরই আটক করবে যাদের বিরুদ্ধে বিপজ্জনক কার্যকলাপের অভিযোগের প্রমাণ আছে (পৃষ্ঠা ১২)। ওই বছরের ২২ জুন কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশ গুলি চালালে নেহরু বলেন 'যে সরকার জনসাধারণের আনুগত্য রাখার জন্যে ঘনঘন গুলি চালাতে বাধ্য হয়, সে সরকার জনসাধারণের আস্থা নিশ্চয়ই খুইয়েছে।'

কেরালায় ১৯৫৭ সালে ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কেরালার চার্চ ও নায়ার সার্ভিস সোসাইটি আন্দোলন শুরু করে। অভিযোগ ছিল তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর কমিউনিস্ট সরকার ক্রমাগত হস্তক্ষেপ করছে। কমিউনিস্ট মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য ভূস্বামীরাও ক্ষুব্ধ হন। কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এই বিমোচন আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে সোসালিস্টরা। জওহরলাল ওই রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই 'বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টির আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলেন। একটি বিক্ষোভ মিছিলে গুলি চললে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। জনবিচ্ছিন্নতা কাটাতে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ইন্দিরা গান্ধী রাজ্য কংগ্রেসকে আন্দোলন সমর্থন করার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সভায় মন্ত্রীসভার ইস্তফা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সভার শেষ প্রান্তে এস. এ. ডাঙ্গে উপস্থিত হন। তিনি বলেন ইস্তফা দিলে ভবিষ্যতে কমিউনিস্টরা আর জনসাধারণের কাছে তাদের নির্বাচিত করার জন্য আহবান জানাতে পারবে না। তিনি বলেন পার্টি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে গিয়ে জানাক ই.এম.এস মন্ত্রিসভা ইস্তফা দেবেনা। আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবণতি রোধ করার জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্র রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করুক। সেই মতন পার্টি সম্পাদক অজয় ঘোষ ও কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে অনুরোধ করেন রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করার জন্য তিনি যেন রাষ্ট্রপতিকে বলেন। শোনা যায় নেহরু পরিহাসছলে কমিউনিস্ট নেতাদের বলেছিলেন 'তোমরা কী করে সমস্ত বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে দিলে ?' যাইহোক ভারত সরকার কমিউনিস্টরা যা চেয়েছিলেন সেই অনুরোধ রক্ষা করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। কমিউনিস্টরা 'ট্রাজিক হিরো' হয়ে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের অনুরোধে পণ্ডিত নেহরু হলেন' নীলকণ্ঠ।'

এই ঘটনা নিয়ে পার্লামেন্টে যে আলোচনা হয় তাতে পার্টির

পক্ষ থেকে কমঃ ডাঙ্গে একটি অসাধারণ ও আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দেন। ডাঙ্গে বলেন, 'সত্যবাদিতার জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি স্পর্শ করতো না। যুদ্ধক্ষেত্রে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' এই অর্ধসত্য গুরু দোণাচার্যকে বলার জন্য তাঁর রথের চাকা মাটি স্পর্শ করেছিল।' কেরালার কমিউনিস্ট সরকারকে গদিচ্যুত করবার জন্য ভারতের দিগদর্শক প্রধানমন্ত্রীর রথের চাকাও মাটি স্পর্শ করলো। পণ্ডিত নেহরু ও ট্রেজারি বেঞ্চ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনেন। এবং অনেকে টেবিল চাপড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

ভারতের কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ঃ কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্যের কথা নেহরু কখনো গোপন করেননি। তিনি বলেছিলেন 'কংগ্রেসের মতাদর্শ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অনেক সমালোচনাই যেমন জোরালো , তেমনি সুনির্দিষ্ট। পরবর্তী ঘটনায় তা অংশত প্রমাণিত। দেখা গেছে ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত কমিউনিস্টদের কিছু কিছু পূর্বেকার বিশ্লেষণ আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভুল। কিন্তু যখনই তাঁরা নির্বিশেষে তত্ত্ব ছেড়ে খুঁটিনাটিতে পা দেন, বিশেষ করে কংগ্রেসের ভূমিকা বিচার করেন তখনই হতাশাজনকভাবে তাঁরা পথ হারান।' এদেশে সংখ্যায় আর প্রভাবে কমিউনিস্টদের পিছিয়ে থাকার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'কমিউনিজম সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে স্বমতে আনার বদলে তাঁরা অন্যদের গালাগাল দেওয়াতেই বেশী মন দিয়েছেন। সে আঘাত ফিরে এসে তাঁদেরই গায়ে লেগেছে এবং তাতে তাঁদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে।'

কিন্তু এ সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধার মনোভাব। তিনি বলেছেন 'কমিউনিস্টরা হলেন সেই মানুষ যাঁরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সোভিয়েত দেশের বাইরে, কমিউনিস্টদের বিস্তর বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আমি বরাবর তাঁদের অশেষ সাহস আর আত্মত্যাগের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। অগণিত মানুষ যেমন দুঃখক্লেশ ভোগ করে, সেইমত তাঁরাও প্রচুর কষ্ট পান, কিন্তু অশুভঙ্কর সর্বশক্তিমান অদৃষ্টের সামনে চোখ বন্ধ করে নয়। তাঁরা দুঃখ বরণ করেন মানুষের মতন, সেই ক্লেশ স্বীকারের মধ্যে থাকে একটা সকরুণ মহিমা।'

কমিউনিস্টদের ও কমিউনিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁদের ও তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে জওহরলালের অভিমানের সুরটাই বেশি ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন - 'আমার শিকড় আজও বোধ হয় অংশত উনিশ শতকের মাটিতে; আমার ওপর মানবতাবাদী উদার ঐতিহ্যের এত বেশি, প্রভাব যে তার থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বুর্জোয়া পটভূমি আমার পায়ে পায়ে লেগে থাকে; স্বভাবতই এটা অনেক কমিউনিস্টের আমার প্রতি চটবার কারণ। আমি গোঁড়ামি অপছন্দ করি; কার্ল মার্কসের রচনা বা অন্যান্য বই অপৌরুষেয় শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে প্রশ্নাতীত বলে মানা, সেইসঙ্গে আধুনিক সাম্যবাদের উপসর্গ হয়ে দেখা দেওয়া বিধিনিষেধের কড়াকড়ি আর মতে না মিললেই পেছনে হন্যে হয়ে লাগা... এসব আমার খারাপ লাগে। রুশ দেশে যা ঘটেছে তার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়.... বিশেষ করে, স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যধিক বল প্রয়োগ। এ সত্ত্বেও সাম্যবাদী দর্শনে আমার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে'।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বরাবরই আকর্ষণ ছিল জওহরলালের। যদিও তিনি অত্যধিক বিধিনিষেধ, ছাঁচে ঢেলে মানুষ গড়ার চেষ্টা, অনর্থক বলপ্রয়োগ এগুলিকে কখনোই সমর্থন করেননি, তেমনই তিনি ধনতন্ত্রের আর সমাজতন্ত্রের বল-প্রয়োগকে এক করে দেখেননি। জওহরলাল মনে করতেন 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগের ব্যাপারটা মনে হয় তার সহজাত; রুশ দেশে বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় হলেও তার উদ্দেশ্য হল শান্তি আর সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন একটি নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে জনসাধারণ সত্যিকার স্বাধীনতা পাবে।'

নেহরু কখনই মনে করেননি যে, সোভিয়েত দেশের সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর মার্কসবাদের সত্যাসত্য নির্ভর করছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস আর নেই, সেই কমিউনিস্টরাও অনুপস্থিত। সোসালিস্টরাও শতধা বিভক্ত। কিন্তু নেহরুপন্থা আছে। দেশের এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যখন ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তখন এই ত্রিশক্তি ঐক্যবদ্ধ হবেন কি হবেন না তারই ওপর নির্ভর করছে এদেশের ভবিষ্যৎ।

১৯১৭-এর বিপ্লবে আবার ফেরা

বিজয় প্রসাদ

পরিকল্পনাকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সীমিত সম্পদকে দ্রুত শিল্প বিকাশের কাজে সদ্ব্যবহার করা এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শিল্প কারখানাগুলিই গড়ে তুলেছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্গকে। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রমের ফলেই পাশ্চাত্যের উদারবাদকে রক্ষা পেয়েছে। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বা ওয়ার কমিউনিজম, নয়া অর্থনৈতিক নীতি, স্তালিনের শিল্পনীতি ইত্যাদির ফলে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ত, তবে ফ্যাসিবাদ পশ্চিম ইউরোপকেও গুঁড়িয়ে দিত।

৭ নভেম্বর রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বার্ষিকী। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে, শ্রমিক কৃষকেরা, সৈনিকদের পাশে নিয়ে জারের রাজত্বকে উৎখাত করেছিল। সেই অক্টোবরে (আমাদের এখনকার ক্যালেন্ডারের নভেম্বরে), বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক এবং কৃষকেরা আরেকজান্ডার কেরেনস্কির নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়াদের অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করে

তাদের সমাজ বিপ্লবের কর্তব্য সম্পূর্ণ করে। নির্বাসন থেকে ফিরে আসা লেনিনের চোখে কেরেনস্কির সরকার ছিল 'ক্ষমতায় থাকা প্রতিবিপ্লবী শিক্ষানবীশ সেনা ও সামরিক চক্র' ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের একটা আচ্ছাদন মাত্র। এদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই হবে। পেট্রোগ্রাডের সোভিয়েত ঠিক এই কাজটিই করেছিল।

কিন্তু সোভিয়েত শতাব্দী খণ্ডিত হয়ে গেল। এটা টিকে ছিল মাত্র সাতটি দশক। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ল। এই পশ্চাৎগমন বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের ওপর প্রবল আঘাত হানল।

এখন, যখন আমরা ১৯১৭-র দিকে ফিরে তাকাব, তখন আমরা কীসের উদযাপন করব?

অভ্যুত্থান একটি শিল্প ঃ আমরা কি সেই ছোট্ট বামপন্থী দলটির কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হব না যারা রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের সাথে মহাযুদ্ধের দুঃসহ দিনগুলিতে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল? ১৯১৪ সালে যুদ্ধের সম্ভাবনা দানা বাঁধতেই প্রধানতম মার্কসবাদী দল জার্মানির পার্টির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত দল যুদ্ধের স্বপক্ষে ভোটদান করে মুখ থুবড়ে পড়ল। একটি ছোট্ট সংখ্যালঘু অংশ বলল, এটা জনগণের যুদ্ধ নয়, জনগণের বিরুদ্ধে চালিত যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ডের জিমেরওয়াল্ডে ১৯১৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী বামপন্থীরা মিলিত হলো আবার ঘুরে দাঁড়াতে। রাশিয়া থেকে এক ঝাঁক নেতারা এলেন। লেনিন থেকে মার্তভ, ট্রটস্কি থেকে রাদেক। শান্তিবাদ তাঁদের পথ ছিল না। 'শান্তির ডাক মোটেই বিপ্লবী শ্লোগান নয়। এটা তখনই বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করবে যখন তাকে বিপ্লবী কৌশলের যুক্তিধারার সাথে যুক্ত করা হবে। যখন এটা বিপ্লবের ডাকের সঙ্গী হবে।' ১৯০২ সালের লেনিনের বই 'কী করিতে হইবে' অনেক সমাজতন্ত্রীকেই পথ দেখালো। এতে বলা হয়েছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ১৮৯৬ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে যখন স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল, তখন লেনিন যুক্তি রেখেছিলেন, 'তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ড দু'টির নিরিখেই বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থান থেকে পিছিয়ে আছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম একটি সুস্থির এবং লাগাতর সংগঠন গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।' এই ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

রাশিয়ার বিপ্লবীরা যে শেষ পর্যন্ত শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ বিস্তৃত করার পথটি খুঁজে পেলো সেটা কম বড় সাফল্য নয়। ১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই শ্রমিক কৃষকেরা তাদের সোভিয়েতগুলি গঠন করে নিজেদের সরকার গঠনের লক্ষ্যে একের পর এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। জন রিড তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন'-এ শ্রমিক কৃষকদের প্রাণশক্তির বর্ণনা দিয়েছেন। 'নাট্যমঞ্চ, সার্কাস অঙ্গন, স্কুলগৃহ, সেনা ছাউনি জুড়ে শুধু ভাষণ, বিতর্ক, বক্তব্যখ.যুদ্ধ ময়দানের পরিখা, গ্রামের মুক্তাঙ্গন, কারখানায় সভাখ এ অপূর্ব এক দৃশ্য, পুতিলোভস্কি কারখানা থেকে চল্লিশ হাজার শ্রমিক বেরিয়ে এসে সোস্যাল ডেমোক্রাট, সোস্যাল রিভোলিউশনারি, অ্যানার্কিস্ট ইত্যাদি যে যাই বলছে তাদের বক্তৃতা শুনছে।' কিন্তু এটাও বোঝা যাচ্ছে, ওদের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। যা হল একটি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই সুস্পষ্ট দাবিই অক্টোবর বিপ্লবের পথ সুগম করেছে। সৈনিকদের প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস ২য় নিখিল রুশ সোভিয়েতসমূহের কংগ্রেসকে লিখে বলেছিল,'এই দেশের প্রয়োজন জনগণের দ্বারা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি স্থায়ী ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। কথাবার্তা, বাকচাতুরি, সংসদীয় ছলচাতুরী আমাদের অনেক দেখা হয়ে গেছে'। তারা একটি দ্বিতীয় বিপ্লব চাইছিল। তারই নেতৃত্ব দিয়েছিল অক্টোবরে লেনিনের রাজনৈতিক দল, বলশেভিকরা। বলশেভিকরা কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের ছক করে নি। তারা শুধু গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গী হয়ে এর দাবি পূরণে নেতৃত্ব দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্র গঠন ঃ আমরা কি ১৯১৭ থেকে ১৯৮৯ অবধি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্ময়কর ও একইসঙ্গে সুকঠিন সাফল্যগুলির উদযাপন করব?

১৯১৮ সালে লেনিন লিখেছেন, 'সোভিয়েতের আদলের নতুন একটি রাষ্ট্র গঠন করে আমরা সুকঠিন সমস্যার একটি ছোট্ট অংশের মাত্র সমাধা করতে পেরেছি। সমস্যার মূল অংশটি নিহিত রয়েছে অর্থনীতির পরিসরে'। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ কোনোভাবেই সহজ কাজ ছিল না। পশ্চিমী শক্তিসহ অক্টোবর বিপ্লবের শত্রুরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছিল। নতুন রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে তখন লাল ফৌজ গড়ে তুলতে হয় যার অর্থ সামাজিক ব্যবহারের খাত থেকে সম্পদ সরিয়ে আনা। সাত দশকের পথচলার কোনো মুহূর্তেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্হিশত্রুর বিপদ থেকে মুক্ত ছিল না। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সামগ্রিক ব্যবস্থাটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

লাল ফৌজের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতির জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের পথ গ্রহণ করতে হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এই উৎকণ্ঠাও ছিল যে শিল্প-সক্ষমতা এবং গ্রামীণ উৎপাদনশীলতা দ্রুত বৃদ্ধির নীতি অতি-কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে। ১৯১৮ সালে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা গ্রিগোরি সোকোলনিকভকে লেখা চিঠিতে লেনিন বলেছিলেন, 'কমিউনিস্টরা আমলায় পরিণত হয়েছে। আমাদের যদি কখনও ধ্বংস হয়, তবে এর জন্যেই হবে'। উন্নয়নের পরীক্ষা নিরীক্ষার শত্রুদের চাপ ও অবরোধের ঘেরাটোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেশের কলকারখানা ও মানব

সম্পদের দ্রুত বিকাশ ঘটানোর তাড়নায়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল করার পথে হাঁটল সোভিয়েতগুলি। তাদের সামনে খুব বেশি বিকল্পও প্রস্তুত ছিল না। বিকল্পের এই স্বল্পতার জন্যেই প্রতিষ্ঠানগত ত্রুটিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নকে গ্রাস করে।

ছোট্ট বলশেভিক পার্টি থেকে নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯৩৩ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষে। পার্টি এতটাই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে সংস্কৃতি, শিল্প, দর্শন, প্রযুক্তিগত বিজ্ঞান সহ নানা ক্ষেত্রে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নতুন কর্মোন্মাদনা জাগাতে সমর্থ হয়। নতুন নতুন এই ভাবনার উদ্ভাবন এসেছে আর কিছু থেকে নয়, এসেছে বিপ্লবী আদর্শ এবং এর বাহক দল থেকে। পার্টির তরফে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পর্বে সোভিয়েত রাজনীতির ঐশ্বর্যময় দিকগুলির ওপর আসা আঘাতের ফলে আদর্শগত প্রেরণার অবর্তমানে আনুষ্ঠানিকতা প্রবল হয়ে উঠল। পার্টির সদস্যরা হয়ে ওঠে আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তা। পার্টির রাজনৈতিক জীবনে শূন্যতা এনে করে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজে চলে যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। জারের প্রশাসন যন্ত্রের লোকেরা ইউরোপে নির্বাসন নেওয়ার ফলে প্রয়োজন দেখা দেয় যোগ্য লোকদের এনে আমলাতন্ত্রের শূন্যতা পূরণের। এতেও অবস্থার পরিবর্তন হল না যার ফলে পার্টির সোকোলনিকভ সহ অসংখ্য প্রাণবান পার্টি সদস্য, ভাষাবিদ ভোলোশনিকভ, জ্ঞানসাধক মেডভেদেভ, নাট্য পরিচালক মেয়েরহোল্ড, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ভাভলিভ, পিয়ানো বাদক গায়িভোবাকে শুদ্ধিকরণের পর্বে খুন হতে হল। রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত হয়ে অথবা প্রাণদণ্ডের মাধ্যমে, পার্টিই সবচেয়ে বেশি মেধাবী সদস্যদের হারালো।

এই সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও সাফল্য যা এসেছিল তা ছিল অবিশ্বাস্য। পরিকল্পনাকে কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিচালকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সীমিত সম্পদকে দ্রুত শিল্প বিকাশের কাজে সদ্ব্যবহার করা এর ফলেই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শিল্প কারখানাগুলিই গড়ে তুলেছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্গকে। এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রমের ফলেই পাশ্চাত্যের উদারবাদকে রক্ষা পেয়েছে। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বা ওয়ার কমিউনিজম, নয়া অর্থনৈতিক নীতি, স্তালিনের শিল্পনীতি ইত্যাদির ফলে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ত, তবে ফ্যাসিবাদ পশ্চিম ইউরোপকেও গুঁড়িয়ে দিত। প্রকৃতপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কারখানা শহরগুলি যেখানে জার্মান সেনাকে খতম করার জন্যে ইস্পাত ও মর্টার তৈরি হয়েছিল, সেখানে এসেই হিটলারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইন্তেকাল হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নকে এতটাই বিধ্বস্ত করে যার জন্যে তাদেরকে আরেকবার যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের পথে যেতে হয়। পশ্চিমীদের অবরোধ শুরু হয় আবার। মহাযুদ্ধে দু'কোটি মানুষের মৃত্যুর পরও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে কোনো বিরামের অবকাশ ছিল না। সোভিয়েত জনগণের সুমহান আত্মত্যাগ নিয়ে যতই বলা হোক সেটা কমই বলা হবে। দুর্ভাগ্যবশত এর সুফল আত্মস্যাৎ করেছে উদারবাদ, কমিউনিজম নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানতম দুর্বলতা ছিল, জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বিকাশ সেখানে ঘটানো হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, সেখানে গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব পশ্চিমী দেশগুলি গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীর দাবিদার হয়েছে। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস লিখেছিলেন, 'আমাদের এই গণতন্ত্রের যুগে এখন ভাঙন এসেছে'। ফরাসী চেম্বার অব ডেপুটিতে পিস্তল হাতে এক মজুরের চকিতে ঢুকে পড়ার প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছিলেন। সেই মজুর উচ্চকণ্ঠে বলেছিল, 'আর কোনো ডেপুটির প্রয়োজন নেই। এখন আমরাই প্রভু'। ১৮৪৮ সালে সেটা ঘটার ছিল না। কিন্তু এই অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের ইচ্ছা, এটাই সাম্যবাদের দুর্দমনীয় সন্ধিমুখ। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে লেনিন সরাসরি ঠিক এই ইচ্ছারই রূপায়ন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা কল্পজগতের অধিবাসী নই। আমরা খুব ভালো করেই জানি যে একজন অদক্ষ শ্রমিক বা একজন রন্ধনকর্মী এক্ষুনি প্রশাসন পরিচালক হয়ে উঠবেন না। এখানে সূচক শব্দটি হচ্ছে 'এক্ষুনি'। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। একবার প্রশিক্ষণ পেলে প্রতিজন রন্ধনকর্মী প্রশাসক হতে সক্ষম হবেন। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের বিপ্লব অজেয় হয়ে উঠবে যদি নিজেকে ভয় না পায়, যদি সর্বহারার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে'। যদিও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তুলনায় সুপ্রিম সোভিয়েত শ্রমিক কৃষকের প্রতিনিধিত্ব ছিল অনেক বেশি এবং এর নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণি (ব্রেজনেভ) বা কৃষক সমাজের (ক্রুশ্চেভ) অভ্যন্তর থেকে উঠে এসেছে, তবু সর্বহারার হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর কার্যকরীভাবে ঘটে নি। সাম্যবাদের সামগ্রিক প্রতিশ্রুতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধ্যবাধকতার জন্যে পূরণ হয় নি।

কার্যকরী গণতন্ত্রের অভাব মানে সেখানে আমলাতন্ত্র ও অচলাবস্থার দিকে একটি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, যা সামাজিক উদ্বৃত্তগুলির গতিপথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তিত করার জন্যেই আস্কারা পেয়েছিল। কোসিগিনের ১৯৬৫, ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের উদ্যোগের মত ব্যবস্থাগত সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলি অকৃতকার্য হয়েছে। এগুলো সবই ছিল ওপর থেকে নেমে আসা উদ্যোগ। জনসাধারণ বা পার্টির অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে নি। এগুলো সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তিতে শেষ হওয়া বিগত শতকের আটের দশকে গর্বাচেভের নেতৃত্বে উপর থেকে নিচে নিয়ে আসা

উদ্যোগের মতই। গর্বাচেভ খোলা হাওয়া (গ্লাসনস্ত) ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন (পেরেস্ত্রোইকা) আমদানি করেছিলেন যার ফলে ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে এই রুশ শব্দগুলির প্রবেশ ঘটেছিল। ওই সময়ে চিনেও একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। উনি যা যা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন তার অধিকাংশ কোসিগিনের বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগের আদলে তৈরি হয়েছিল। গর্বাচেভ যে কাজটা নাটকীয়ভাবে করেছিলেন এবং পটপরিবর্তনের চিহ্নায়ক হিসেবে যে শব্দটি ঘোষিত হয়নি, তার অর্থ ছিল বহুদলীয় নির্বাচনের জন্যে তদ্বির করে কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার উপর কেন্দ্রীভূত আক্রমণ নামিয়ে আনা। সেই শব্দ ডিমোক্রেটিজাটসিয়া বা গণতন্ত্রীকরণ সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙে দিয়ে সেগুলোকে সুবিধাবাদী দলীয় আজ্ঞাদাস এবং বেসরকারি ব্যবসায়ীদের সামনে ভক্ষ্য হিসেবে এগিয়ে দেয়। এরাই রাশিয়ার প্রথম ধনকুবের যারা সোভিয়েত জনগণের সামাজিক সম্পদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। রাষ্ট্রের এমন আচমকা ভাঙনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে খাদের তলায় ঠেলে ফেলতে বোরিস ইয়েলৎসিনের (আনাতোলি চুবাইস ও ইয়েগর গাইদারের মত বুদ্ধিবৃত্তিক স্যাঙাৎ সহ) মত অশুভ রাজনীতিকের অভ্যুদয় হয়। এমনকী, যে কথাটি প্রায় বলাই হয় না, ইয়েলৎসিন জেনারেল পাভেল গ্রাচেভের সমর্থন নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর একটি প্রতিবিপ্লব সংগঠিউ করেছিল। এটা ছিল অক্টোবর প্রতিবিপ্লব।

কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ ঃ পঁচিশ বছর হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের। শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজের আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক শক্তিক্ষয়ের মত যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছে বামপন্থীরা সেগুলি ঘটেছে সোভিয়েতের পতনের আগেই। তৃতীয় বিশ্বের ঋণ সংকট, মালবাহী জাহাজ, উপগ্রহ প্রযুক্তি ও কম্পিউটারের মত প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, অপেক্ষাকৃত স্বল্প জ্বালানি মূল্য এবং মেধাসম্পদ সম্পর্কিত নতুন জমানা- এই সমস্ত কিছুর মিলিত ফলাফলে একটি বিশ্বব্যাপী পণ্যচক্র তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সীমানার পরিধিকে এড়িয়েই এখন পণ্য চলাচল করে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, শুধু যে রাষ্ট্রগুলির তাদের অর্থনীতির উপর কর্তৃত্ব থাকছে না তাই নয়, কলকারখানা বা খামারে সংগঠন গড়ে তোলাও কঠিনতর হয়ে উঠেছে। ১৯৮০-র সময়পর্ব থেকেই কমিউনিজমের মূল ভিত্তি যে শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজ তারা অনেকটাই শক্তিহীন হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পুঁজির এই নতুন পর্বে সাম্রাজ্যবাদীদের অধিষ্ঠানকে শক্তি জুগিয়েছে।

পুঁজিবাদের গতিকে প্রতিহত করার মত বিকল্প কোনো শিবির রইল না। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সেই অমলিন পংক্তিগুলি এখনও সত্য যেখানে বলা হয়েছিল, 'পণ্যের সুলভ মূল্য হচ্ছে সেই গোলা যা চিনের প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করে, যা বিদেশিদের প্রতি বর্বর জাতিদের নাছোড়বান্দা ঘৃণাকে বশ্যতায় নিয়ে আসে। এরই কারণে নির্মূল হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা বহন করেও সমস্ত জাতি বাধ্য হয় বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে'। 'নির্মূল হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা' অংশটি এই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত হিংস্রতার অনুরণন বহন করে। এমনকী বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারটাও একটা ভাঁওতা। এতে শুধু পুঁজির ভয়াল খিদে মেটানোর খাদ্যতালিকায় যুক্ত হওয়াই হয়, শ্রমশক্তির অধিকারের বলে পুরোনো সামাজিক সম্পর্ক নিঃশেষিত হয় না (দাসত্ব ও ঋণ বেড়ি এখনও মেক্সিকোর মাকুইলাডোরাস ও বাংলাদেশের বস্তি এলাকার কারখানায় চালু রয়েছে)। আত্মরক্ষার দুর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নেই। ব্রেজনেভ জমানায় দক্ষিণ আফ্রিকা বা মধ্য আমেরিকার গেরিলা সংগ্রামের জন্যে সমর্থনহীন সময়টিও নেই। পাশ্চাত্যের একমেরুতা (মার্কিন নেতৃত্বে) বিশ্বব্যবস্থাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে।

স্মৃতিমেদুরতা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ফিরে যাওয়ার পন্থা হতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে কী অবদান রেখে গেছে সেটাই অবলোকন করতে হবে। পুঁজিবাদের বিকল্প। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা। ব্যর্থতাকে সঙ্গী করেই সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গড়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শিক্ষা গ্রহণের অনেক বিষয় রয়েছে। অসংখ্য প্রশংসনীয় সাফল্য। রয়েছে সমালোচনার যোগ্যও বহুদিক। কমিউনিজম আজকের সময়ের বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে সহজেই আত্মপ্রকাশ করার মত একটি ব্যবস্থা নয়। মানব ইতিহাসের যাবতীয় অসুস্থতা নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় অনুপ্রবেশ ঘটাবে। সৃজনশীলতার পাশাপাশি সতর্কতাও জরুরি। পেরুর মার্কসবাদী জোস কার্লোস মারিয়াতেগুই (১৮৯৪-১৯৩০) লিখেছেন, কমিউনিজমকে 'অবশ্যই একটি বীরোচিত সৃজন হয়ে উঠতে হবে'। পূর্ণ বিকশিত চেহারায় এটা কখনও উদিত হয় না। একে লড়ে পেতে হয়। ভুলত্রুটিকে অনুধাবন করতে হয়। এর সাফল্যকে অন্তস্থ করতে হয়। মারিয়াতেগুই লিখেছেন, কমিউনিজম 'বীরোচিত মেজাজ ও আবেগদীপ্ত আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়'। আমরা সকলেই মানুষ। কিছুই খুঁতহীন নয়। কমিউনিজমের মর্মবাণী হচ্ছে দীর্ঘদিনের নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন প্রত্যাহ্বানের যুগান্তরে যাত্রার অভীপ্সা।

ভাষান্তর শুভ প্রসাদ নন্দী মজুমদার
মার্কসবাদী পথের সৌজন্যে

জাতীয়তাবাদ সংখ্যালঘুর কথা ভাবে না। নাগরিক জাতীয়তাবাদ দক্ষিণ এশিয়াতে স্বপ্ন মাত্র।

শুভ বসু

আধুনিক জাতিরাষ্ট্র পুঁজিবাদী বিশ্বর সৃষ্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতি গঠন নিয়ে ইউরোপ কেন্দ্রিক ধারণা তৈরী হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে' নেশন' শব্দটার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ সেই অর্থে নেই।

হালফিল বেনেডিক্ট অ্যান্ডার্সন বলেছেন যে 'জাতি' একটি কল্পিত সমাজ যা এম্পটি হোমোজেনাস টাইম এর উপরে অবস্থিত। কিন্তু জাতি 'রাষ্ট্র' বাদ দিয়ে কল্পনা করা যায় না। জাতিরাষ্ট্র'র মূল ভিত্তি স্থানিক। জাতিরাষ্ট্র'র নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকতে হবে যা আবার ইউরোপীয় মানচিত্রের ধারণা থেকে গৃহীত হয়েছে। ইউরোপের মানচিত্রে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ধারণা এসেছে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির ধারণা থেকে। থাই ঐতিহাসিক থংচাই উইনীচকূল দেখিয়েছেন , ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানচিত্র কি ভাবে জাতিরাষ্ট্র'র ধারণা এশিয়া তে প্রভাবিত করেছে। আর এই মানচিত্র কোনো একক ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। কেউ জাতি গঠনের মানচিত্র কে কোনো সম্প্রসারিত ফ্রন্টিয়ার এর ধারণা দিয়ে চিহ্নিত করেন। এন্থনি স্মিথ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এথনিসিটি র ধারণার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা যেমন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা হোমি ভাবা জাতি গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন অন্দর মহল এবং বাহির মহলের তত্ত্ব। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে ভারতের ক্ষেত্রে অন্দর মহল হলো আধ্যাত্মিকতা, সেখানে দক্ষিণ এশীয়রা নিজেদের কে ইউরোপীয়দের থেকে উচ্চমার্গের বলে মনে করেন। আর বাহির মহল হলো বস্তুজগতের উন্নতি, মানে বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রযুক্তি এক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপীয়দের উচ্চতর জায়গায় স্থান দেন। এই দুইয়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতে 'জাতি'র ধারণা তৈরী হয়েছে। আবার হোমি ভাবা 'জাতি' গঠনের প্রক্রিয়াকে narration বা কাহিনী বিধৃত করার প্রক্রিয়া বলেছেন। সম্প্রতিকালে মনু গোস্বামী দক্ষিণ এশিয়াতে জাতি গঠনের প্রক্রিয়াতে কিভাবে স্পেস বা পরিসর তৈরির গল্প রয়েছে তার কথা উল্লেখ করেছেন আঁড়ি লেফেব্রেকে কেন্দ্র করে। সুমথি রামস্বামী তাতে যোগ করেছেন মানচিত্রের গল্প। প্রকৃত পক্ষে ভারতে বারানসিতে ১৯৩৬ সালে ভারতমাতা মন্দির স্থাপিত হয় তাতে কোনো বিগ্রহের পরিবর্তে সেকালের ব্রিটিশ ভারতের মানচিত্রকে বিগ্রহ করে দেখানো হয়।

কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে। আসলে আমরা যখন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করি তখন ১৯৭১ সালের পরের ভূখণ্ড হিসাবে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের কল্পিত সমাজের ভিত্তি নয়, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে জাতিসত্ত্বার বিবর্তনের একটি অংশ মাত্র। আমরা যদি এন্থনি স্মিথ এবং বেনেডিক্ট এন্ডারসনের মধ্যে একটি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের ধারণার উৎস খুঁজি, তাহলে তার উৎস দুটি। একটি হলো ব্রিটিশ ভারতের ১৮৭২ সালের জনগণনা, যাতে বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে মুসলমান সমাজকে সংখ্যা গরিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে একটি মজার ঘটনা রয়েছে । সেটি হলো বঙ্কিম ছিলেন একেবারে বাঙালি জাতিয়তাবাদী। তবে তিনি বন্দে মাতরম গানে যে 'জাতিসত্ত্বা' র কল্পনা করেন তা হলো সার্বিকভাবে একটি বাঙালি হিন্দু জাতিস্বত্ত্বার কল্পনা। সেখানে বাংলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাঙালি রাষ্ট্রর কল্পনা রয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম সবার চাইতে ভালো ভাবে জানতেন যে বাংলাভাষীর মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই কারণে তাঁর 'আনন্দমঠ'- এ তিনি ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব চেয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে বাঙালি হিন্দুরা বাঙালি মুসলমানদের বাঙালি ভাবতেন না। শরৎচন্দ্র যিনি মহেশের মতো সংবেদনশীল গল্প লিখেছেন, তিনিও মনে করতেন বাঙালি আর মুসলমান দুটি আলাদা সত্ত্বা।

বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে উদীয়মান মধ্যবিত্তরা তাঁদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কথা জানতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতেন। আবু হোসেন সিরাজীর লেখা পড়ুন , আবুল মনসুর আহমদের লেখা পড়ুন বা একবারে ধর্ম নিরপেক্ষ আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর লেখা পড়ুন বা কামরুদ্দিন আহমদের লেখা পড়ুন সবাই নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন। ১৯১৮ সালে শহীদুল্লাহ সাহেব শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে একটি সভাতে বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেন।

আসলে মূল বিষয়টা হলো মানচিত্র আর জাতিসত্ত্বা। যা নিয়ে তর্ক তা হলো বাঙালি হলো আলাদা জাতিসত্ত্বা না ভারতীয় সভ্যতার একটি জাতিসত্ত্বা। ১৯৪০ সালে বাংলায় মুসলমান মধ্যবিত্তরা সবাই মনে করতেন ভারতে বাঙালি মুসলমান একটি আলাদা জাতি সত্ত্বা। ভারত কোনো জাতি হতে পারে না। তার ভিত্তি ছিল ১৮৭২ সালের জনগণনা। ১৯৪৭ সালের অখণ্ড বাংলা আন্দোলনের পুরোধা আবুল হাশিম সেই একই কথা বলেছিলেন। ফলে ১৯৭০ সালে শেখ মুজিবর রহমান যখন বাঙালি জাতিয়তাবাদের নাম ভোট চেয়েছিলেন তখন মানচিত্রে বাংলাদেশ কিন্তু একটি বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র হবে লেবাননের মতো তা দুই ধর্মের রাষ্ট্র হবে না তা তিনি জানতেন। সেই জন্যে তিনি ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান এবং অখণ্ড বাংলা

চেয়েছিলেন আর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের পরে যে ভূখন্ড বাংলাদেশ বলে পরিচিত হয় ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে তা তিন দিকে ভারত বেষ্টিত। ফলে ভারত তাদের উপর আধিপত্য করবে কি না সেই নিয়ে তাঁদের গভীর সন্দেহ থেকে যায়। তাঁরা অনেকেই ভারত কে বহুজাতিক কৃত্রিম রাষ্ট্র হিসাবে ভাবেন যা পরা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়ে বাংলাদেশ কে গিলে খাবে। এখন সেই চিন্তাই প্রবল। কারণ পাকিস্তান ১৯৭১ সালের পর বহু দূরের রাষ্ট্র। ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী। জাতিসত্ত্বার কল্পনার ভিত্তিতে কিন্তু ১৮৭২ এর লোক গণনা ১৯৪৭ এর রাডক্লিফ লাইন ১৯৭১ এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ একটি অন্যরেখা। কল্পিতজাতি সমাজের পরিসরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ খুব সহজেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। ফলে অধিকাংশ বাংলাদেশী মনে করেন তাঁরা বাঙালি জাতি কিন্তু তাদের জাতীয় পরিচয় বাংলাদেশী। উর্দু ও বাংলার মধ্যে যে সংঘর্ষ তা শ্রেণী সংঘর্ষ। পাকিস্তানেও উর্দু সংখ্যালঘুদের ভাষা কিন্তু অষ্টাদশ শতকে উর্দুর সঙ্গে আশরাফ পরিচিতিবোধের সম্পর্কের জন্যে তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পাঞ্জাবি ,পুস্তু বা সিন্ধি বা বালুচ বলেন সে দেশের কৃষক, কিন্তু মধ্যবিত্তরা উর্দু বলেন।

আমার জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব পড়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে এটি হলো ধারণা। ভারতের বিভিন্ন অংশে জাতীয়তাবাদের বিকাশের থেকে এই ধারণা ভিন্ন। কাজেই ভারত বাংলা সম্পর্কের মূল ধারা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে গেলে এই ধারণা বুঝতে হবে। তাহলে প্রশ্ন থাকতেই পারে পশ্চিমবাংলা বা আসামে যে বিশাল বাংলা ভাষী মুসলমান রয়েছে বা বাংলাদেশে হিন্দু সমাজ রয়েছে তাদের কি হবে। উত্তরটা জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে । জাতীয়তাবাদ সংখ্যলঘুর কথা ভাবে না। সিভিক বা নাগরিক জাতীয়তাবাদ এখনো দক্ষিণ এশিয়াতে স্বপ্ন মাত্র। তামিল সিংহল সম্পর্ক, বা পাকিস্তান পাঞ্জাবিদের সঙ্গে বালুচ, পাখতুনদের সম্পর্ক নেপালে ম-দেশিদের সঙ্গে পাহাড়িদের, আফগানিস্তানে পাখতুনদের সঙ্গে তাজিক, ছগ্ঘিথন্থ দের সম্পর্ক দেখুন তাহলে আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। ভারতের কথা আমার নিজের লেখা The Dialectics of Resistance Colonial Geography– Bengali Literati and the Racial Mapping of Indian Identity বইটি কষ্ট করে দেখে নিতে পারেন।

লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

শাসনের মুখ্য ভূমিকায় কি মহামান্য আদালত ?

অশোক সরকার

আদালত এখন প্রতিদিনই খবরের শিরোনামে। খবরের কাগজ বা টেলিভিশন চ্যানেল খুললেই আজকাল রোজই মহাগুরুত্বপূর্ণ খবরগুলির মধ্যে থাকে আদালতের খবর। কোনও ফাস্ট ট্রাক আদালত, কোনও না কোনও হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের খবর প্রধানমন্ত্রীর খবরের মতই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয়। এ রকম তো চিরকাল ছিল না। দুতিন দশক আগে খবরের কাগজে অনেকটা ভিতরের পাতায় ‘আইন-আদালত’ বলে একটা কলম থাকত তাও প্রতিদিন নয়। সপ্তাহে এক দিন। দূরদর্শনে আইন নিয়ে নানা অনুষ্ঠান হত এখনো হয়, সেগুলি আইনি সচেতনতা বাড়ানোর জন্য, আদলতের খবর দেবার জন্য নয়।

আদালতের খবর এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন ? সেটা কি শুধুই লাইভ স্ট্রিমিং চালু করার জন্য? নাকি আইন আদালত বিষয়ে সাধারণভাবে মানুষের আগ্রহ বেড়ে গেছে ? একটু খতিয়ে দেখা যাক। আমার মতে রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটে গেছে, আদালত নিয়ে আগ্রহ তারই ফলশ্রুতি।

প্রথম কারণ সরকারের অনেক বিতর্কিত নীতি। শুধু বিজেপি-এনডিএ সরকারের নয়, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও এই ব্যাপারে কিছু কম যায়না। কয়লা ব্লক বিতরণ, স্পেকট্রাম বিতরণ, কুড্কুলাম নিউক্লিয়ার পাওয়ার, সালয়া জুডুম, মনে করুন। এছাড়া আরও কয়েকটি জনসমক্ষে স্ক্যাম বলে পরিচিত, যেমন অগাস্টা ওয়েস্টলান্ড হেলিকপ্টার, কমনওয়েলথ গেমস, ইত্যাদি। এই সরকারের ক্ষেত্রেও বিতর্কিত নীতি এবং দুর্নীতি, কোনটারই অভাব নেই। নোটবন্দী, ৩৭০, তিন-তালাক, ধর্মান্তর, এনআরসি-সিএএ, তিনটে কৃষি আইন, ইলেক্টোরাল বন্ড, অগ্নিবীর, রাফায়েল, আদানি, সেবি। রাজ্য সরকারগুলিকে ধরলে তালিকা অনেক লম্বা হবে।

বিতর্কিত নীতি ও দুর্নীতি - দুই ক্ষেত্রেই কেউ না কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয়। বিতর্কিত নীতিগুলি অধিকাংশই জনস্বার্থ বিরোধী হয়, কাজেই নাগরিক সমাজের নানা সংগঠন সঠিক কারণেই তা আদালতে চ্যালেঞ্জ করে। দুই, স্ক্যাম, বিরোধী পক্ষের রাজনীতির বড় হাতিয়ার, ওই বিষয়ে চেঁচামেচি করা ছাড়াও তাদেরি কেউ না কেই আদালতকে তার বিচার করতে বলে বা বিচারের উপর নজরদারি করতে বলে। এই ধরণের বিতর্কিত এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় যদি কোন বড় নেতা, বা আমলা

জড়িয়ে থাকেন, তাহলে তা সাধারণ মানুষের নজর কাড়ে, সেই খবরে মানুষের উৎসাহ বাড়ে, এবং মিডিয়ারও নজর কাড়ে। তখন আদালতের খবরের গুরুত্ব বাড়ে।

দুর্নীতির কথাটা আলাদা করে বলতেই হয়, আমাদেরই পার্থ, জোতিপ্রিয়, অনুব্রত, শেখ শাহজাহানের কাহিনী যেমন এক ধরণের দুর্নীতি, তার পাশাপাশি, পেপার লিক, ব্রিজ ভেঙ্গে পড়া, ফেক ওষুধ, মূর্তি ভেঙ্গে পড়া, ইত্যাদি -- দুর্নীতির ব্যাপকতা ও গভীরতা দুটোই দেশব্যাপী। আগে দুর্নীতি হলে সরকার নিজেই তদন্ত কমিশন বসাত, কোন মন্ত্রী নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সরে দাঁড়াতেন, একটা দুটো আমলা ট্রান্সফার বা সাসপেন্ড হতেন। এখন যেহেতু সরকার প্রথমেই দুর্নীতি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে, তাই আদালতের দ্বারস্থ হতেই হয়। দুর্নীতি যেহেতু বিরোধী শক্তির বড় হাতিয়ার তাই তারা তো দুর্নীতি নিয়ে হই চই করেই, কিন্তু এখন তাদের প্রতিনিধিরা আদালতে যান। আদালত থেকে দুর্নীতির একটা সুরাহা পাবার চেষ্টা করেন। ইলেক্টরাল বণ্ড তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আদালতে গেছেন ইলেক্টরাল বণ্ডের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

আদালতের খবর আর একটা কারণে মহাগুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা হল ইডি-সিবিআই-ইনকাম ট্যাক্স। এরা যতদিন আসল ক্রিমিনালদের পিছনে সময় ব্যয় করত, ততদিন তা জনসমক্ষে ছিল না। তারা তাদের কাজ নীরবে করত, আদালত তাই। কিন্তু গত দশ বছরে বিশেষত ২০১৯ এর পর থেকে এদের কাজ হয়েছে শুধু বিপক্ষের নেতা-নেত্রীদের জেলে পোরা। এই কাজটি তারা এমন বে-লাগাম, বে-আইনি এবং আব্রু বিহীনভাবে করে থাকে যে সবাইকেই আদালতের শরণাপন্ন হতেই হয়। আদালতকেই ফয়সালা করে বলতে হয় এই গ্রেপ্তারি সঠিক না বেঠিক। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয়টি আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। প্রতিটি গ্রেপ্তারি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে তা মিডিয়ার জায়গা পায়, মিডিয়ার অধিকাংশ সেই গ্রেপ্তারি সমর্থন করে কল্প-কাহিনী বানায়, কিছু ব্যতিক্রমী মিডিয়া তার বিরোধিতা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা প্রকাশ করে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই আদালত চলে আসে সামনে। আদালত কি বলছে তাই নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়ে।

শুধু কি বিপক্ষের নেতা নেত্রী? গত ২০ বছরে ইউএপিএ জাতীয় কালা কানুনগুলি অসংখ্যবার ব্যবহার হয়েছে সমাজকর্মী ও ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে। জেএনইউ, জামিয়া-মিলিয়া, আলিগড়, চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাষ্ট্রের কালা কানুনের শিকার হয়েছেন, স্ট্যান স্বামী, রোনা উইলসন, সোমা সেন, আনন্দ তেলতুম্বে, জি এন সাইবাবা, ইত্যাদি বহু সমাজ কর্মী এমনকি গান্ধিবাদি নেতারাও বাদ যান নি। এঁদের গ্রেপ্তারি সব ক্ষেত্রেই আদালতে গেছে। মূল স্রোতের মিডিয়া বা বিপক্ষ দল এই নিয়ে খুব একটা সরব না হলেও নাগরিক সমাজের একটা বড় অংশ এই নিয়ে সরব হয়েছে। সৌভাগ্য এই যে সমাজ মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সক্রিয় উপস্থিতি থাকায়, বিষয়গুলি জনসমক্ষে থেকেছে, এবং আদালতকেও তা নজরে রাখতে হয়েছে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সমাজকর্মীরা বা ছাত্ররা বেকসুর খালাস পেয়েছেন, বা জামিন পেয়েছেন, এবং মামলা ঠাণ্ডা ঘরে চলে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আদালতের ভূমিকা সামনে এসেছে, মানুষ আদালত কি বলছে জানতে আগ্রহী থেকেছে।

সাম্প্রতিক কালে আদালতের গুরুত্ব বাড়ানোর পিছনে রাজ্যপালদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যপালেরা চিরকালই কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন, এক কালে তাঁরাই সরকার ফেলতে ও গড়তে বিশেষ ভূমিকা নিতেন। ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে সরকার ফেলা হত, সেই ধারা প্রয়োগের সুপারিশ রাজ্যপালের কলমেই লেখা হত। অবশ্য মাঝে কিছুকাল ৩৫৬-র প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাজ্যপালেরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটা সীমাবদ্ধ সমঝোতা করে চলতেন। গত দশ বছরে রাজ্যপালেরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন এবং তাদের সক্রিয়তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু বা কেরালা , যেখানে শক্তিশালী বিরোধী পক্ষের সরকার রয়েছে, সেখানে রাজ্যপালেরা খোলাখুলি বিজেপি নেতার মত আচরণ করছেন, এমন সব নীতিগত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যা স্পষ্টতই অসাংবিধানিক এবং বারবার এই সব সিদ্ধান্তগুলি আদালতে এসে ধাক্কা খাচ্ছে, নাকচ হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের সংঘাত এমনিতেই প্রথম পাতার খবর, তা আদালতে গেলে সেটা আরওই আলোচনার খোরাক হচ্ছে, এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়ে উঠছে।

দেশের আইনসভা মানে লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভাগুলিই বা পিছিয়ে থাকে কেন। আইনসভাগুলিও দেখিয়ে দিল তারাও কম যায় না। দল বদলুদের ব্যাপারে স্পিকারের কাজকর্ম, লোকসভা -রাজ্যসভা থেকে সদস্যদের পাইকারি হারে বহিষ্কার, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে, আদালতকে নাক গলাতে হয়েছে। বিধানসভা-লোকসভা-রাজ্যসভায় কি হচ্ছে তা নিয়ে সাধারণ পাঠক খুব একটা মাথা না ঘামালেও, ঘটনার নাটকীয়তা, মিডিয়ায়

তার প্রচার, আদালতে জজেদের চোখা চোখা প্রশ্ন,সবই আদালতের প্রতি মানুষের নজর বাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদালত নিজেদের কাজের জন্যই নানা কারণে শিরোনামে এসেছে। চারজন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র বিচারপতি-র প্রেস কনফারেন্স, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক বিচারপতি-র প্রকাশ্য সরকারি পক্ষ সমর্থন, অবসর নিয়েই রাজনীতিতে নেমে পড়া, সংবিধানের বাইরে গিয়ে সনাতন ধর্মের আধারে বিচারের রায় দেওয়া (হিজাব জাজমেন্ট), বিচারপতিদের ব্যক্তিগত আচরণ (বোবদে প্রধান বিচারপতি থাকার সময়, বিজেপি কর্মকর্তার হ্যালে ডেভিডসন বাইকে চড়ে ছবি, চন্দ্রচূড়ের বাড়ির গণেশ পূজায় প্রধানমন্ত্রীর ছবি) ইত্যাদি নানা কারণে এক সময় শীর্ষ আদালতগুলির নাম হয়ে গেছিল Executive Court, যার মানে আদালতে সংবিধান নয়, সরকারের দৃষ্টিতে ন্যায় নির্ধারণ করছে। বিশেষত আগের তিনজন প্রধান বিচারপতির আমলে সুপ্রিম কোর্ট তথা হাইকোর্টগুলি এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা হেডলাইন হবারই যোগ্য। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই আদালত খবরের শিরোনামে আসবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

সরকারের সঙ্গে আদালতের সম্পর্ক নানা কারণে হেডলাইন হয়েছে। আদালত বলেছে অমুক অমুক ব্যক্তিকে জজ করতে হবে, সরকার বসে রইল, এক বছর পর তাদের মধ্যে কাউকে নিযুক্ত করল, কাউকে করল না। একজন ভিন্ন লিঙ্গের বলে পদ পেলেন না, আরেকজন নাকি সরকারের সমালোচক, তাই বাদ গেলেন। তৃতীয় একজন কেন পদ পেলেন না জানাই গেল না। একজন তো দু বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করে, তাঁর নাম ফিরিয়ে নিলেন, বললেন আমার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কাজ নেই। শুধু কি তাই, সরকার এমন এক আইন বানাল যাতে জজ কে হবেন তা ঠিক করবে সরকার। সুপ্রিম কোর্ট বলল তা চলতে পারে না। এই সব প্রতিটি ক্ষেত্রে জন সমক্ষে উকিলসমাজে হইচই কিছু কম হয় নি, সেই সুবাদে বড় হেডলাইন হয়েছে।

এই সব হেডলাইনের পিছনে, একটু তলিয়ে দেখলে ভারতের শাসন ব্যবস্থার কিছু মৌলিক অবক্ষয়ের কথা সামনে আসে। আদালতের কথা দিয়েই শুরু করি। জামিন সংক্রান্ত মামলাগুলি, এবং অন্যান্য বেশ কিছু মামলার বিবরণী দেখলে এটাই স্পষ্ট হয়, সাংবিধানিক আদালত বলে পরিচিত হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বদলে, স্পষ্টত সংবিধান বিরোধী হলেও আইনের বিধানগুলিকেই সম্বল বলে মনে করেছে। সংবিধান নাগরিক কে যে সুরক্ষা দিয়েছে তার পাশে না দাঁড়িয়ে, সুরক্ষা খর্বকারি আইনগুলির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর অন্যদিকে সংবিধানকে আধার না করে সনাতন ধর্মকে আধার করেছে। একটা উদাহরণ এই ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলায় বিচারপতি বিবাদীর কুস্টি দেখতে চেয়েছেন, তাকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ ছিল পাত্রি-র মাঙ্গলিক আছে তা পাত্র পক্ষের কাছ থেকে লুকোনো হয়েছিল, তাই পাত্র ডিভোর্স চায়। এই মামলা এলাহাবাদ হাইকোর্টে গেলে জজ বললেন কই দেখি কুস্টীতে কি লেখা আছে? ভারতীয় সংবিধানের ন্যায় বিচারের আধারের মধ্যে জ্যোতিষকে এক কণা জায়গা দেওয়া হয় নি, কিন্তু কে শোনে কার কথা।

সরকারি বিতর্কিত নীতি আর দুর্নীতি-র মূলে রয়েছে সরকারের শ্রেণী চরিত্রের কথা। নিও লিবারাল যুগে সরকার যতই সমাজ ও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, ততই সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাজার ব্যবস্থার প্রভাব বেড়েছে। এখন তা নিতান্তই প্রকট হয়ে উঠেছে। এক শিল্পপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে একটা পুরো রাজনৈতিক দল তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে, প্রশ্ন তোলা সাংসদদের গ্রেপ্তার বা বহিষ্কার করা হয়, টেন্ডার ছাড়াই এক শিল্পপতিকে বন্দরের কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়। শিল্পপতিদের অনুকূলে পরিবেশ আইন লঘু করা হয়, পরিবেশ ছাড়পত্র মুকুব করা হয়, নেতা মন্ত্রীরা দেশের এক শিল্পপতির ফেক ওষুধের সমর্থনে প্রেস কনফারেন্স করেন --- উদাহরণের অভাব নেই। তবে শুধু শিল্পপতিদের কথা বললে খুবই কম বলা হবে। বাজার ব্যবস্থার ফায়দা নিয়ে যে এলিট শ্রেণী তৈরি হচ্ছে, তার একটি অংশ ভারতে আরেকটি অংশ থাকেন উন্নত দেশগুলিতে। এই এলিটশ্রেনীর বিশেষত্ব এই যে তাঁরা একেবারেই গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নন, এঁরা সমাজের বাকি অংশের চেয়ে নিজেদের আলাদা করে দেখেন, এবং মনে করেন সমাজের বাকি অংশটা যেন তাঁদের তাবেদার হয়েই থাকে। তাই তারা শক্তিশালী নাগরিক সমাজের অত্যন্ত বিরোধী, এমনকি গণতান্ত্রিক রীতিনীতি-র ঘোর বিরোধী। ফলে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে

প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা দায়বদ্ধতা ও গণতান্ত্রিকতার দিকে দেশ এগিয়েছিল, সেগুলি এই এলিটশ্রেণি নানা ভাবে স্যাবোতাজ করেছে। এই নিওলিবারাল এলিট খুব সচেতনভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেছে, তার বদলে যেখানে সম্ভব প্রাইভেট বাজার নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেমন শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, আবাসে, বিদ্যুতে, পানীয় জলে, পরিকাঠামোয়, , কত উদাহরণ দেব। এই এলিট দেশের সম্পদের উপর পুরো দখল চায় তাই এদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সরকারকে ও রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ও গনতান্ত্রিকতার মৌলিক নিয়মগুলি ভাঙতে হচ্ছে।

দলীয় রাজনীতিতেও একটা মৌলিক অবক্ষয় এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনীতি একসময় ছিল কর্তব্য, পরে হয়ে গেল পেশা, এখন সবাই জানে রাজনীতি হল বড়লোক হবার সহজ রাস্তা, মানে ব্যবসা। রাজনীতি ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ায়, রাজনীতির প্রেরণাটাই বদলে গেছে। দেশ গড়ব, সমাজ বদলাব, সমাজে সমতা ন্যায় আনব এই প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে রাজনীতির মূল প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতা, পজিশন, স্ট্যাটাস, প্রিভিলেজ ইত্যাদি। ফলে রাজনীতি থেকে নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। এলিটের স্বার্থপরতার সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি জুড়ে গিয়ে এমন এক রাজনীতি তৈরি হয়েছে, যার মূল কথা হল ক্ষমতায় থাকার জন্য গণতান্ত্রিকটা নৈতিকতা বিসর্জন দিতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি ধ্বংস করতে হবে, গণতান্ত্রিক বিপক্ষকে শত্রু মনে করে তাকে নির্মূল করতে হবে, এবং যে কোন রকম বিরোধকেই দমন করতে হবে।

আদালত ও শাসনব্যবস্থা আজ এক বিশেষ সম্পর্কের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। উপরের অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যারা, সেই বিপক্ষ, বিবেকবান জনসমাজ, দলিত আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর মানুষ, যারা আজ বুঝতে পারছেন সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ, আমলা- এঁদের থেকে পাবার কিছু নেই, এঁরা এখনো আদালতের উপর ভরসা ছাড়েন নি। এঁরা ভাবছেন আদালত যেহেতু সংবিধানের ভিত্তিতে চলে, তাই সংবিধানকে অবলম্বন করে আদালত দেশকে বাঁচাবে, হয়ত বা চালিয়েও দেবে। বর্তমান প্রধান বিচারপতির সময়ে বেশ কিছু সরকার বিরোধী কঠিন সিদ্ধান্ত মানুষের আশাকে কিছুটা জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল আদালত কি দেশ বাঁচাতে পারবে?

লেখক আজিমজি প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল- বিভেদ ও বিতর্ক সৃষ্টির চেষ্টা

মজিবুর রহমান

এই বছর আগস্ট মাসের আট তারিখে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু সংসদের বাজেট অধিবেশনে লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। বিরোধী দলের সাংসদরা বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিলটি পর্যালোচনা করার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি জানান।পরের দিনই মন্ত্রী মহোদয় লোকসভার ২১ ও রাজ্যসভার ১০ মোট ৩১জন সাংসদকে নিয়ে একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন বিজেপির উত্তর প্রদেশের সাংসদ জগদম্বিকা পাল। কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ২২ আগস্ট। ২৯ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও সংগঠনের কাছ থেকে বিলটির ব্যাপারে মতামত ও পরামর্শ আহ্বান করা হয়। এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। জেপিসি'র সদস্যরা দেশের বিভিন্ন শহর পরিদর্শন করে ওয়াকফ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। জেপিসি'র মিটিং হচ্ছে। এরকম একটি মিটিংয়ে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের সময় গ্লাস ভেঙে একজন সাংসদের হাত কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এবছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে জেপিসি'র প্রতিবেদন পেশ করার কথা।

'ওয়াকফ' একটি আরবি শব্দ এবং এর আক্ষরিক অর্থ হল 'বন্দিত্ব ও নিষেধাজ্ঞা'। ইসলাম ধর্মে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে চিরতরে কোনো সম্পত্তি সম্প্রদান করাকে ওয়াকফ বলা হয়। জমি জায়গা, ঘরবাড়ি, টাকা পয়সা প্রভৃতি যেকোনো জিনিসই ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ওয়াকফ সম্পত্তিতে নির্মিত হয় মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, দরগাহ, ইয়াতিমখানা, কবরস্থান, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার ইত্যাদি। ওয়াকফ তহবিল থেকে প্রদান করা হয় ইমাম, মোয়াজ্জিনদের ভাতা। দুস্থ, মেধাবী পড়ুয়া এবং পীড়িত, প্রতিবন্ধী মুসলিমদের আর্থিক সহায়তা করার সংস্থানও রয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম পালন ও প্রচার এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে বেশকিছু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওয়াকফ ব্যবস্থা সংযুক্ত। বিভিন্ন সময়ে ভারতের মুসলিম সম্রাট, সুলতান, নবাব, জমিদাররা তাঁদের প্রভূত সম্পত্তি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে দান করে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, হুগলির হাজি মোহাম্মদ মহসিনের কথা উল্লেখ করা যায়। এখনও বিত্তশালী মুসলমানরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করে চলেছেন। এর ফলে, ভারতে বিশাল পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি গড়ে উঠেছে। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, রেল ও প্রতিরক্ষা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য যেকোনো দপ্তরের ভূসম্পত্তির থেকে ওয়াকফ ল্যান্ডের পরিমাণ বেশি। শুধু তাই নয়, ভারতে যত ওয়াকফ

সম্পত্তি রয়েছে বিশ্বের কোনো মুসলিম দেশেও তত ওয়াকফ সম্পত্তি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম সমাজের ওয়াকফ সম্পত্তির মতোই হিন্দু সমাজে রয়েছে 'দেবোত্তর সম্পত্তি'। মঠ, মন্দির, টোল, শ্মশান নির্মাণ এবং নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এসব রয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতে কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করার ভার সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ট্রাস্টের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।কিছু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমলে রচিত ধর্মীয় সম্পত্তি আইন আজও প্রায় একই রয়ে গেছে। যেমন, ১৯২৫ সালের শিখ গুরুদ্বার আইন অনুযায়ী এখনও শিখ সমাজের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী পরিচালিত হয়। স্বাধীন ভারতে ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ আইন তৈরি করা হয়। এই আইন অনুসারে, জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল এবং রাজ্য পর্যায়ে ওয়াকফ বোর্ড গঠিত হয়। জেলা পর্যায়েও ওয়াকফ কমিটি রয়েছে। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন আরও সুসংহত করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ২০১৩ সালে একবার ওয়াকফ আইন সামান্য সংশোধন করা হয়। ২০২৪ সালে উত্থাপিত বিলে ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনে ৪৪টি সংশোধনী আনা হয়েছে। অর্থাৎ আইনটির খোলনলচে বদলে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৫৪, ১৯৯৫ ও ২০১৩ সালের ওয়াকফ আইন বা সংশোধনীকে দেশের মুসলিম সমাজ স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের সংশোধনী বিলকে তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় কারণ এই বিলের উদ্দেশ্যটাই ভীষণ আপত্তিকর। কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজের দ্বারা গঠিত সম্পত্তি, মুসলিম সমাজের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তি এবং মুসলিম সমাজের দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তি ঘুরপথে হস্তগত করার দূরভিসন্ধি নিয়ে আইন তৈরি করতে এই বিল আনা হয়েছে। বিলটি আইনে পরিণত হলে মুসলিম সমাজ ধর্ম পালন ও নানাবিধ ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তারা আর্থিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলের সভাপতি হন ওয়াকফের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সভাপতি ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সদস্যকে মুসলমান হতে হয়। কিন্তু ওয়াকফ সংশোধনী বিল-এ কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অমুসলিম হওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সভাপতি সহ সকল সদস্য মুসলমান হন। কিন্তু বিলের প্রস্তাব অনুসারে বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য অমুসলিম হতে পারবেন। বিলটিতে ওয়াকফ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞের অন্তর্ভুক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে।বর্তমান আইন অনুযায়ী কাউন্সিল ও বোর্ডের সদস্যরা কিছু নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত হন। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সকলেরই সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মুসলিমদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকে সংখ্যালঘু করার প্রস্তাব পুরোপুরি প্রথাবিরোধী। যেকোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক রীতি। যেমন, শিখ গুরুদ্বার আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে শিখ হতে হয়। দেবোত্তর সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টে সাধারণভাবে কোনো অহিন্দুকে রাখা হয় না। তাহলে ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার প্রস্তাব আসছে কেন? বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে একটা চরম পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ করতে চাইছে।

সাংবিধানিকভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ধর্মকে সমদৃষ্টিতে দেখা এবং কোনো ধর্মের বিরোধিতা না করার বারংবার বলা হয়েছে। নাগরিকদের ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ধর্মাচরণের সময় রাষ্ট্রের বিরোধিতা, সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন বা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টের কোনো ঘটনা না ঘটলে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারের চর্চা না করাই শ্রেয়। ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যাপারে সঙ্গত কারণ ছাড়া সরকারের হস্তক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই অনভিপ্রেত। সংবিধানের ২৬ নাম্বার অনুচ্ছেদে ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও পরিচালনার অধিকার সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৭ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় অর্থকে করমুক্ত করেছে। অনুচ্ছেদ ২৯ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুচ্ছেদ ৩০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০০(ক) কাউকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না করার কথা বলেছে। কাজেই বলা যায়, সংবিধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের যে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিলটি তা হরণ করতে চাইছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের জন্মলগ্ন থেকেই চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের বিপদে বা বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টা করে।আর এস এস-বিজেপির এই অবস্থানের কথা অবশ্য কারোর অজানা নয়। সম্প্রতি সেটাই আরও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমানে বিজেপির একজনও মুসলিম সাংসদ নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলিম সদস্য নেই। বেশ কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চালানোর পর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে।ধর্মীয় বিধি নিয়ে বিতর্ক বাঁধিয়ে ২০১৯ সালে তিন তালাক আইন তৈরি করা হয়েছে। ওই বছরই কাশ্মীর উপত্যকার বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদানকারী ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মুসলিমদের

ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ বন্ধ করার জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদের মনে নাগরিকত্ব হারানোর ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তৈরির কথা বলা হয়। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তন করার কথা বলা হয়।গোরক্ষার নামে বা গোমাংস খাওয়ার 'অপরাধে' নিরীহ মুসলমানদের মেরে ফেলা হয়। মুসলিমদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলা হয়, না বললে পেটানো হয়। হিন্দু পুরুষদের মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করতে উৎসাহিত করা হয়।মুসলিম প্রেমিক ও হিন্দু প্রেমিকার বিবাহ বন্ধনকে 'লাভ জেহাদ' তকমা দিয়ে প্রতারণা ও ধর্মান্তরিত করার অভিযোগে মুসলিম পুরুষটির জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়। সিনেমার সাহায্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়।পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম শাসকদের খুব খারাপ ভাবে চিত্রিত করা অথবা পুস্তক থেকে তাদের প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া হয়।বিজেপির এই ধারাবাহিক মুসলিম বিরোধিতা ও বিদ্বেষের তালিকায় যুক্ত হয়েছে ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা পদ্ধতি পরিবর্তনের উদ্যোগ।

হিন্দুত্ববাদী দল বা সরকার মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে যত সক্রিয় হবে মুসলিমবাদী সংগঠনগুলো তত সংগঠিত হওয়ার রসদ পাবে। হিন্দুত্ববাদীরা যেমন চেষ্টা করে হিন্দু জনগণের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে তেমনি মুসলিমবাদীরা চেষ্টা করে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করতে। উভয়েই চায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শত্রু মনে করুক। পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হোক। ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ সৃষ্টি হোক। এরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করার বিরুদ্ধে।এরা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নয়, সংঘাত বাধাতে চায়। ধর্মের নামে সংঘাত যত বাড়ে সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে বঞ্চিত রাখা ও শোষণ করা তত সহজ হয়। মেহনতি মানুষের রুটি রুজির সমস্যার গুরুত্ব নষ্ট হয়।ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে।দেশভাগ ও দাঙ্গায় প্রচুর মানুষের প্রাণহানি তারই নির্মম পরিণতি। মানুষকে ধর্মের নামে বিভাজিত করে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার নীতি বা কৌশল আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও অনুসৃত হচ্ছে। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির কথা মাথায় রেখে সরকার বা প্রশাসন যখন কোনো পদক্ষেপ নেয় তখন অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তার বিরোধিতায় সরব হওয়া। সাম্প্রতিক ওয়াকফ বিতর্ককে সেই আলোকেই দেখতে হবে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সমাজকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত এবং সংবিধান বিরোধী ওয়াকফ সংশোধনী বিল যেন আইনে পরিণত হতে না পারে।

লেখক মজিবুর রহমান, প্রধানশিক্ষক, কাবিলপুর হাইস্কুল , মুর্শিদাবাদ।

মোদী ঘনিষ্ঠ আদানীর মনোপলি বাঁচাও সিন্ডিকেটে সেবি প্রধান মাধবী বুচের ভূমিকা

অমিতাভ সিংহ

'বুচ হ্যায় তো সিন্ডিকেট সেফ হ্যায়', সম্প্রতি রাহুল গান্ধী একটা ভিডিওতে একথাগুলি বলেছেন। সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের বিভিন্ন কাজকর্মে বিপুল স্বার্থের সংঘাত জড়িয়ে রয়েছে। কর্পোরেটদের সঙ্গে শেয়ার নিয়ন্ত্রক সেবি ও সরকারের মাথাদের অশুভ যোগাযোগের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে ভেতর থেকে চুরমার করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে দেশের সামনের এই বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করার বদলে সরকারের মাথারা এই অপরাধের শরিক হয়েছেন নিজেদের ব্যাক্তিগত স্বার্থে। দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছেন বলে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন।

আগস্ট মাসের 'নাগরিকে' একটি দীর্ঘ নিবন্ধে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা থাকলেও পাঠকের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্তভাবে তা একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

গত বছর আমেরিকার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গৌতম আদানি বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রতারণার অভিযোগ প্রকাশ্যে এনে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কর্পোরেট প্রতারণা।

আদানিদের বিরুদ্ধে যে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল তা মূলত বিদেশী তহবিল ঘুরে তা আদানিদের বিভিন্ন সংস্থায় লগ্নি করে শেয়ারের মূল্যকে কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তুলে শেয়ারবাজারে সাধারণ লগ্নীকারীদের ঠকিয়ে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের লোকসান করেছে। মরিসাস ও বরমুডাতে গঠিত এই অস্বচ্ছ তহবিলে ছিল গৌতম আদানির ভাই বিনোদ আদানির সরানো টাকা। এখানে বিনিয়োগ করা ছিল মাধবী বুচের টাকা। সেসময়ে তিনি সেবির পূর্ণসময়ের সদস্য মনোনীত হয়েছেন মোদী সরকার দ্বারা।

রিপোর্টে দেখা গেছে এইসব বিদেশে গঠিত হওয়া অফশোর ফান্ডদুটির টাকা আদানি গোষ্ঠীর বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিপুল লগ্নি করে তাদের শেয়ারের দামকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায়।ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা প্রলুব্ধ হয়ে আসল দামের চেয়ে অনেক বেশী দামে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার কেনে ও যথারীতি কিছুদিনের মধ্যে উক্ত শেয়ারের দাম কমে গেলে তাতে বিপুল লোকসান হয়। সাধারণ লগ্নিকারীদের এই লোকসানের টাকাটা আদানিদের পকেটে এভাবেই ঘুরপথে চলে যায়। এইবার কয়েকমাস পরে ঝুলি থেকে বের হল আরও মারাত্মক সব গোপন তথ্য। শেয়ার বাজার যে সংস্থা নিয়ন্ত্রন করে তার নাম সেবি, যার সদস্য ও চেয়ারম্যান বা চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমান চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ, যাকে নিয়োগ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি এই কেলেঙ্কারির

অন্যতম অংশীদার বলে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে প্রকাশ পেল। মাধবীর স্বামী ধবল বুচও যে এর অংশীদার তাও জানা গেল। এরপর বুচ দম্পতি এই ফান্ডদুটিতে লগ্নী করার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন ও স্বপক্ষে নানা অজুহাত দেখাতে লাগলেন। আবার দেখা গেল সেবির কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তিনি উপদেষ্টা সংস্থা আগোরা অ্যাডভাইজরির মাধ্যমে চালিয়ে গেছেন এবং বিভিন্ন কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়েছেন যার মধ্যে আদানিদের সংস্থাও থাকা অস্বাভাবিক নয়। মাহিন্দ্রার কাছ থেকে তো ২.৯৫ কোটি টাকা ছাড়াও মাধবীর স্বামী ধবল বুচ ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছেন ৪.৭৮ কোটি।

এরই মধ্যে মাধবী বুচ একের পর এক মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে পরে ধরাও পড়লেন।মরিসাস ও বরমুডায় গঠিত এই অস্বচ্ছ ফান্ডদুটি পরিচালনা করত ধবল বুচের বাল্যবন্ধু, যে আবার আদানিদের কোম্পানির ডিরেক্টর। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সেবির পূর্ণ সদস্য থাকার সময় মাধবী ছিলেন সিঙ্গাপুরের সংস্থাটির প্রায় ৯৯ শতাংশ শেয়ারের মালকিন। তিনি পরে সেবির চেয়ারপার্সন হওয়ার পরও সংস্থাটি উপদেষ্টা হিসাবে কাজ চালিয়ে গেছেনা ও গত তিন বছরে আড়াই কোটি টাকা আয় করেছেন।মনমোহন সিং এর আমলে সেবিকে স্বচ্ছ ভাবে কাজ করতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালে নিয়ম হয় কোন সদস্য কোন লাভজনক সংস্থায় কাজ করতে,বেতন নিতে বা অন্য কোন সুবিধা নিতে পারবে না। কিন্তু সেবির চেয়ারপার্সনসহ অন্য সদস্যরা এই নিয়ম ভাঙা সত্ত্বেও মোদী সরকার মাধবী বুচকে পদত্যাগ করতে বলতে পারছেন না। কেন ? মনে করে দেখুন ২০০৯ সালে মনমোহন সিং সরকারের আমলে সত্যম কেলেঙ্কারি প্রকাশ পাওয়ার পর সংস্থার চেয়ারম্যান ও সিইও রামলিঙ্গম রাজু সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ মোদী সরকার অনবরত মাধবী বুচদের বাঁচাতে চেষ্টা করে চলেছেন। বিজেপির মন্ত্রী,সাংসদ ও অন্য নেতারা এই প্রসঙ্গ উঠলেই পাগলা কুকুরের মত তেড়ে আসছে। তারা বুঝতে পারছেন না যে এই কেলেঙ্কারির ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান,এলআইসি ইত্যাদি সংস্থার ওপর প্রবল প্রভাব পড়বে,কারণ বিজেপি সরকারের নির্দেশে এদের প্রচুর লগ্নি আছে আদানীদের সংস্থাগুলিতে। আবার এই ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে সাধারণ মানুষের লগ্নি রয়েছে। ফলে এই কেলেঙ্কারির যথাযথ তদন্ত যা একমাত্র যুগ্ম সংসদীয় কমিটি বা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি (জেপিসি) করতে পারে বলে কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি মনে করে ও সেইমত তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে। যা মোদী সরকারের নাপছন্দ। সংসদের গত অধিবেশনে এই দাবীকে এড়িয়ে যেতে মোদী সরকার সময়ের আগেই অধিবেশন সমাপ্ত করে দিয়েছিল।

বেশ কিছুদিন ধরে এই কেলেঙ্কারির নতুন নতুন মোড় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নতুন অভিযোগ উঠেছে।সেগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

★ বুচের উপদেষ্টা সংস্থা আগোরা এডভাইজরিতে মাধবীর ৯৯ শতাংশেরও বেশী শেয়ার ছিল। এই সংস্থাটি বিভিন্ন সংস্থাকে পরামর্শ দিয়ে আয় করেছে ২.৯৫ কোটি টাকা। তখন তিনি সেবির সদস্য ও চেয়ারপার্সন ছিলেন।

★ স্বামী ধবল বুচের তহবিল বা ফান্ড সংস্থা ব্ল্যাকস্টোনে যোগ যারা বিপুল লগ্নি করে আরইআইটি তে। আরইআইটির নিয়ম বদলানো হয় মাধবীর চেয়ারপার্সন থাকার সময়।

★ মাধবী সেবির সদস্য ও চেয়ারপার্সন থাকার সময় তিনি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে বেতন ও অন্যান্য খাতে ১৬.৮ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। এমনকি আইসিআইসিআই তে থাকাকালীন এর সঙ্গে যোগ পাওয়া গেছে অজিত ডোভালের পুত্র শৌর্য ডোভালের। শৌর্য বেসরকারি লগ্নি সংস্থা গ্রেটার প্যাসিফিক ক্যাপিটালের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং এই সংস্থার সঙ্গে মাধবীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

★ সেবির ৫০০ জন অফিসার ভারত সরকারের কাছে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন মাধবীর অধীনে সেবিতে কাজের পরিবেশ দিনে দিনে বিষাক্ত, অপমানকর ও ভয়ের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

★ আই সি আই সি আই ও ব্যাঙ্ক অব পান্‌জাবের সংযুক্তিতে নিয়ম ভেঙে ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

★ অবসরকালীন সুবিধার সময়ের ব্যবধান,কর্মী শেয়ার ১০ বছর ধরে ভাঙানো,শেয়ারের দাম বাড়ার সুবিধা মাধবীকে দেওয়া হলে তা থেকে অন্য কর্মীদের বঞ্চিত করা,শেয়ার বিক্রি করার সময় টিডিএস কাটা ও তা মাধবীর আয় হিসাবে না দেখিয়ে আয়কর আইন লঙ্ঘন করা ইত্যাদি প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

★ চেয়ারপার্সন থাকাকালীন মাধবী ওকহার্ডের শাখা ক্যারল ইনফো সার্ভিসেস থেকে ভাড়া বাবদ কয়েক কোটি টাকা আয় করেছেন। এইসময়ে ওকহার্ডের বিরুদ্ধে সেবি বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত চালাচ্ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে তদন্ত ধামাচাপা দিতেই এই বাড়ীভাড়ার উৎকোচ কিনা। ক্যারল ইনফো সার্ভিসেস থেকে ২.১৬ কোটি টাকা পেয়েছেন মাধবী বুচ।

★ মাধবীর আমলে সেবির স্বায়ত্তশাসনের সমাপ্তি ঘটেছে সরকারি মদতে। তারা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছে।সেই কারণে লোকসভা নির্বাচনর বুথ ফেরত সমীক্ষার পর শেয়ার দর বিপুল বাড়িয়ে ও ফল দিন তার পতনের মাধ্যমে জালিয়াতির অভিযোগ ধামাচাপা দেওয়াতে ভূমিকা নিয়েছেন তিনি।

★ সেবির পূর্ণ সময়ের সদস্য অনন্ত নারায়ন গোপাল কৃষ্ণন স্টক ব্রোকারকে বাড়ী ভাড়া দিয়ে ৬৪.৮ কোটি টাকা আয় করেছেন। এছাড়া ইনক্রিডের এক লক্ষ শেয়ার ৭০ কোটি টাকায় কিনেছেন যার বর্তমান মূল্য ৮৮০০ কোটি টাকা।

★ মহিন্দ্রার বিরুদ্ধে সেবির মামলা চলাকালীন মাহিন্দ্রা বুচদের কাজ দিয়েছে ও ধবল বুচকে নিয়মিত বেতন দিয়েছে। আবার পরামর্শের জন্য অর্থও দিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এই অভিযোগ করা অসঙ্গত হবে না যে মাধবীর পক্ষে শেয়ার বাজারের গোপন ও সংবেদনশীল তথ্য পাওয়া সম্ভব ছিল ও তিনি তার স্বামী

ধবলকে জানিয়ে দিয়ে তার থেকে লাভ করেছেন।

★ চেয়ারপার্সন থাকাকালীন মাধবী শেয়ার কেনা বেচা করেছেন।

মাধবী পুরী বুচকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পিএসি বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য গত ২৪ অক্টোবর হাজিরা দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। কিন্তু মাধবী এড়িয়ে যান। বিজেপির সদস্যরা তাকে ডেকে পাঠানোয় খুব্ধ হন। এটা সহজেই বোধগম্য যে কেন মাধবী পিএসিকে এড়িয়ে যাওয়ার সাহস পেলেন। মোদীসহ বিজেপির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ভয় পাচ্ছেন আরও কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়া ও তাতে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের যোগাযোগ পাছে ফাঁস হয়ে যায়। এদিকে এত অভিযোগ ওঠার পরেও মাধবীর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

এই ব্যবস্থার ফলে আদানিরা বন্দর, বিমানবন্দর, বৈদ্যুতিক শক্তি,সিমেন্ট, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করছে যার পিছনে আছে মোদীর নেতৃত্বে দল ও বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। এদের নিয়েই মোদীর মনোপলি (আদানীদের) বাঁচাও সিণ্ডিকেট যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন রাহুল গান্ধী। সংসদের আগামী অধিবেশনে এ নিয়ে ঝড় যে উঠবেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিধানসভা নির্বাচন সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটানোই বিজেপির একমাত্র পথ

শুভ মিত্র

'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়,' -- মহারাষ্ট্রে এই হল মোদীর নতুন স্লোগান। আসলে তিনি যেটা বলেন নি সেটা হল মোদী, শাহ, আদানি, অম্বানী ,মহিন্দ্রা,সেবির চেয়ারপার্সন মাধবী বুচ যদি এক থাকে তাহলে সুরক্ষিত থাকবেন। মোদীর গত দশ বছরের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে তাই মনে হয়।

মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনে জয় পেতে মোদী শাহ জুটি যে ব্লু প্রিন্ট তৈরী করেছেন তাতে একমাত্র অ্যাজেন্ডা সাম্প্রদায়িক বিভাজন আর কংগ্রেসসহ বিরোধীদের সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করা। নির্বাচন কমিশনকে তো আগেই পকেটে পুরে নেওয়া হয়ে গেছে। নাহলে যেখানে ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোট একদিনে সম্পন্ন করা যায় সেখানে ৮১ আসনের ঝাড়খন্ড বিধানসভায় নির্বাচন দুদিনে করতে হচ্ছে কেন? ১৫ নভেম্বর আদিবাসী সমাজের নেতা শহীদ বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে মোদী তাঁর দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে প্রোপাগান্ডা করে বলতে পারেন জনজাতিদের জন্য তাঁর সরকার কত কি করেছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেছেন 'জো বাটেঙ্গে উসকো কাটেঙ্গে।' আসলে কংগ্রেসের জাতি ভিত্তিক জনগণনার দাবীতেই মোদী শাহ যোগী বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন। তারা ভাল করেই জানেন গণনার দাবী মেনে নিলে এরপর প্রকৃত সামাজিক চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সংরক্ষনের প্রশ্ন উঠতেও সময় লাগবে না।তাহলেই বিপদ। কারণ বিজেপি আরএসএস একটা মনুবাদী সংগঠন। উঁচু জাতের ওপর তাদের পক্ষপাত সর্বজনবিদিত। উল্টে মোদীই এখন সভাগুলিতে বলছেন কংগ্রেস সংরক্ষণ উঠিয়ে দিতে চাইছে। প্রকৃত সত্য এই যে, কংগ্রেসই সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ছিল। জনজাতিদের জন্য ২০০৬ সালে জল জঙ্গলের অধিকার আইন এনেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বে মনমোহন সরকার। স্বাধীনতার পর তপসিল জাতি ও উপজাতিদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা তো কংগ্রেস আবহমানকাল ধরে করে এসেছে।মোদী তার ভাষণে বলেছেন জেএমএম কংগ্রেস জোট সরকার অনুপ্রবেশকে মদত দিয়েছে। তারা জনজাতির রোটি ও বেটি কেড়ে নেবে।এর ফলে জনজাতির সংখ্যা কমে যাবে।জনবিন্যাসেও বিশাল পরিবর্তন হয়ে যাবে। যার নূণ্যতম ভৌগলিক জ্ঞান আছে তারা জানেন যে ঝাড়খন্ডের সীমান্তে বাংলাদেশ বা কোন অন্য কোন দেশ নেই যে অনুপ্রবেশ ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এরকম কোন ঘটনাই ঘটে নি,মোদীর মিথ্যাভাষণের প্রত্তুত্তরে এর চেয়ে বেশী আর কি বলবেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনের আগে হেমন্ত সরেনকে গ্রেপ্তার করে ভাবলেন লোকসভায় জিতে গিয়েছি। এবার বিধানসভায় বিজেপির পতাকা ওড়ানো হবে। কিন্তু হেমন্তর বিরুদ্ধে চার্জশীট পর্যন্ত না দিতে পারার জন্য তিনি জামিন পান। সুপ্রিম কোর্ট তীব্র তিরস্কার করে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলিকে। এই জন্য মোদীর চিন্তা বেড়ে গেছে তাই এই রাজ্যে তাকে জনজাতিদের মধ্যে মিথ্যা প্রচার করতে হচ্ছে।কখনও বা রাহুল গান্ধীর প্রচারের ব্যাঘাত করতে হচ্ছে প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তার হেলিকপ্টার সময়মত উড়তে না দিয়ে। কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও বামপন্থীদের মধ্যে জোট খুব ভালো ভাবেই গঠিত হয়েছে। ঝাড়খন্ডে গত ১৩ নভেম্বর একদফা ভোট হয়ে গিয়েছে। অবশিষ্ট ৪০ টি আসনে ভোট হবে আগামী ২০ নভেম্বর।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোট গত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল।পরে শিবসেনা ও এনসিপিতে ভাঙন ধরিয়ে সরকার গঠন করলেও সেই সরকার কখনও সুস্থির ছিল না।আপাদমস্তক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত অজিত পাওয়ারকে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে তার ওপর থাকা অভিযোগগুলি শিকেয় তুলে কবছর কাটালেও তাদের মহাদ্যুতি সরকারের মধ্যে যে কোন মিল নেই তা বার বার প্রমাণিত। সাম্প্রদায়িক প্রচার মোদী শাহ চালিয়ে গেলেও তাতে তার দলের নেত্রী পঙ্কজা মুন্ডের সায় নেই। তিনি বলেছেন এইরাজ্যে ওইসব ইস্যুতে ভোট হবে না,ভোট হবে গত সরকারের কাজের ভিত্তিতে।একই বক্তব্য শোনা গেছে বিজেপির সহযোগী

ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা শিবসেনা নেতা একনাথ শিন্ডের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন জাতপাত নিয়ে কথা বলব না।মানুষ ভোট দেবেন আমাদের সরকার চালানো দেখে। এনসিপির এক অংশের নেতা অজিত পাওয়ার বলেছেন মোদী যা বলছেন তা মহাদ্যুতি জোটের লাইন নয়। রাজ্যের সমস্যা নিয়ে ভোট হবে। মোদী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মহা আগারি জোটের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে সুবিধা নিতে।কিন্তু গত লোকসভার মত এবারেও কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ও শারদ পাওয়ারের এনসিপির জোট খুব সাবলীল ও মোলায়েমভাবে সম্পন্ন হয়েছে।কোন বিভেদ বা মনেমালিন্য আছে বলে খবর নেই। ফলে এইরাজ্যের নির্বাচনে মহা আগারি জোট যে গত লোকসভার মত ফল করবে সে আশা করাই যায়।

মহারাষ্ট্রের ২৮৮ টি আসনে ভোট হবে আগামী ২০ নভেম্বর।

স্মরণ :
‘অগ্নিকন্যা’ মতিয়া চৌধুরী আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক : ঢাকা, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

৮২ বছর বয়সী মতিয়া চৌধুরী বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে নিশ্চিত করেছে তাঁর পরিবারের একটি সূত্র।

মতিয়া চৌধুরীকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে তাঁর পারিবারিক সূত্র জানিয়েছিল। ওই সূত্র বলে, মতিয়া চৌধুরীর কবরের জন্য জায়গা চেয়ে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে। জায়গা না পাওয়া গেলে তাঁর স্বামী প্রয়াত সাংবাদিক বজলুর রহমানের কবরে তাঁকে দাফন করা হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘অগ্নিকন্যা’ হিসেবে পরিচিত মতিয়া চৌধুরীর জন্ম পিরোজপুরে ১৯৪২ সালের ৩০ জুন। তাঁর বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা এবং মা নুরজাহান বেগম ছিলেন গৃহিণী। ১৯৬৪ সালের ১৮ জুন খ্যাতিমান সাংবাদিক বজলুর রহমানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মতিয়া চৌধুরী।

মতিয়া চৌধুরী শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসন থেকে ছয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৬ ও ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মতিয়া চৌধুরী। ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে তিনি জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরও তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

মতিয়া চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় বামপন্থী রাজনীতি দিয়ে। তিনি ইডেন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬০,এর দশকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে উত্তাল আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়, তাতে মতিয়া চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ও নেতৃত্ব দেন। আইয়ুব খানের আমলে চারবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (EPSU) সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি।

ছাত্র আন্দোলন থেকে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (NAP) সংগঠনে আসেন। তিনি সম্ভবত বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টিরও সদস্য ছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মত পার্থক্য ও ভাঙনের সময় তিনি সোভিয়েত পার্টির পক্ষ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে তিনি অধ্যাপক মুজফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন NAP এ যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আত্মগোপন করেন ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেন।

স্বাধীনতার তিন বছরপর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে পাক - মার্কিন মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক সামরিক চক্র নৃশংস ভাবে হত্যা করে। দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। জিয়া ও এরশাদ উভয় শাসনের বিরুদ্ধেই গণ সংগ্রামে মতিয়া চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। গত শতকের ৯০এর দশকে তিনি সাম্প্রদায়িক সামরিক জুন্টা চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৃহত্তম মঞ্চ আওয়ামী লীগে যোগ দেন। এরপর তিনি দলটির হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে রাজপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সামরিক সরকারের সময় কারাবরণ করেন।

তসলিমা নাসরিন লিখেছেন - ‘বাংলার অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর মিরপুরের মাটিতে জায়গা হয়নি। মিরপুরের বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে জায়গা দেওয়ার বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আসতে হয়। আবেদন করেও কার্যালয় থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি। অনুমতি না পাওয়ায় তাঁর স্বামী প্রয়াত সাংবাদিক বজলুর রহমানের কবরে তাঁকে দাফন করা হয়।’

‘‘১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয়, তাতে মতিয়া চৌধুরী সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আইয়ুব খানের আমলে চারবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভূমিকার জন্য ২০২১ সালে বাংলা একাডেমি মতিয়া চৌধুরীকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ দেয়।’’

তবে এই বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্তিম বেলায় তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়নি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুর পর স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ‘গার্ড অব অনার’ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও মতিয়া চৌধুরীর ক্ষেত্রে তা হয়নি।’’

একদিক থেকে ভালো যে তিনি মৃত, তাঁকে দেখতে হয়নি, যে মাটিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য তিনি একদা যুদ্ধ করেছিলেন, সেই মাটিতে তাঁকে সমাধিস্থ করার জন্য চার ফুট জায়গা পাওয়া যায়নি।

চলে গেলেন কিংবদন্তী নাট্যকার অভিনেতা মনোজ মিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ নভেম্বর সকালে প্রয়াত হলেন প্রয়াত অভিনেতা, কিংবদন্তি নাট্যকার মনোজ মিত্র। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬। গত কয়েকমাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। সেপ্টেম্বরে দিন কয়েক ভর্তিও ছিলেন হাসপাতালে। সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। জানা গিয়েছে, শারীরিক সমস্যার কারণে ক্যালকাটা হার্ট ইন্সিটিউটে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সোডিয়াম-পটাশিয়াম-ক্রিয়েটিনিনের সমস্যা ছিল বলেও জানা গিয়েছে। মনোজ মিত্রের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সাতক্ষীরায়, যা বর্তমানে বাংলাদেশে। পড়াশোনা স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। শিক্ষকতা করেছেন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৭ সাল থেকে মঞ্চে অভিনয় এবং তার প্রায় দু' দশক পরে সিনেমায় অভিনয় শুরু করেন।

১৯৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হয় 'পথের পাঁচালী'। 'অপু'র চরিত্রে পার্থপ্রতিম চৌধুরী 'অপু'র বন্ধু 'প্রণব'-এর চরিত্রে মনোজ মিত্র। তখন মূলত গল্প লিখতেন তিনি। পার্থপ্রতিমের তাড়নাতেই মনোজের লেখা প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'; ১৯৫৯ সালে। স্কটিশ চার্চে পড়াকালীনই তিনি থিয়েটারে দীক্ষিত হন। কলেজে নিয়মিত অনুষ্ঠান হতো। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এমএ করেন এবং ডক্টরেটের জন্য গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু ততদিনে তিনি বাংলা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র পরিচালক পার্থ প্রতিম চৌধুরী সহ আরও কিছু বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তৈরি করে ফেলেছেন নাটকের দল 'সুন্দরম' (১৯৫৭)। পরবর্তী সময়ে এই নাটকের দলটি লেখক এবং অভিনেতা মনোজ মিত্র দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই নাটকের দলটি বিশ্বব্যাপী ৭০০ টিরও বেশি নাটকের শো করেছে। পাঁচের দশকের শেষভাগে 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় প্রথমবার। তারপর থেকে একের পর এক কালজয়ী নাটক লিখেছেন মনোজ মিত্র। ১৯৭২ সালে তাঁর খ্যাতি আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে 'চাক ভাঙা মধু'-র মাধ্যমে।

'বাঞ্ছারামের বাগান', 'ঘরে বাইরে', 'শত্রু'-সহ একাধিক ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকের মন জয় করেছে। 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে তাঁর অভিনয় জায়গা করে নিয়েছে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে। সময় যত এগিয়েছে, মঞ্চ থেকে পর্দা, দিনে দিনে অভিনেতা হিসেবে সকলের মন জয় করেছিলেন মনোজ। শুধু কি অনুরাগীদের মন জয় করেছিলেন ? তাঁর ঝুলিতে দিনে দিনে এসেছে বহু পুরস্কার।

মনোজ মিত্র লিখিত নাটক ঃ সাজানো বাগান, চোখে আঙ্গুল দাদা, কালবিহঙ্গ, পরবাস, অলকানন্দার পুত্র কন্যা, নরক গুলজার, অশ্বত্থামা, চাকভাঙ্গা মধু, মেষ ও রাক্ষস,নৈশভোজ, ছায়ার প্রাসাদ, গল্প হেকিম সাহেব, রাজদর্শন, দেবী সর্পমস্তা, মুন্নি ও সাত চৌকিদার, রঙের হাট , যা নেই ভারতে।

যদিও উপরোক্ত নাটকগুলির বেশিরভাগই সুন্দরম ও বহুরূপী গোষ্ঠীর দ্বারা প্রযোজনা করা হয়েছিল। এছাড়াও তিনি ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের প্রযোজিত ' হঠাৎ বৃষ্টি ' চলচ্চিত্রে একটি প্রাণময় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর রচনা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মনোজ মিত্র চলচ্চিত্র এবং থিয়েটারের উপর বেশ কিছু বই লিখেছেন।

বাংলার আপনজন রাদিচে প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ভাষার 'স্বজন' হিসেবে পরিচিত উইলিয়াম রাদিচে আর নেই। গত ১১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ এলাকায় বাংলা সাহিত্যপ্রেমী রাদিচের জীবনাবসান হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি একাধারে কবি, গবেষক ও অনুবাদক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু কবিতা, গল্প এবং মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' যাঁর তর্জমায় ইংরেজিভাষী পাঠক মহলে পৌঁছে গিয়েছিল অনায়াসে, তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের তিরোধান বাংলাভাষীদের জন্য একটা অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার ওপর ১০-১১ বছর আগে ইংল্যান্ডে গুরুতর দুর্ঘটনার জেরেও তাঁর জীবনের স্বাভাবিক পথচলা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

বিলেতের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের 'স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (সোয়্যাস)-এ বাংলা ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম রাদিচে বাংলাদেশ ও ভারত বাদে বহির্বিশ্বেও একজন প্রাজ্ঞ গুণীজন হিসেবে পরিচিত। ইংরেজিভাষী এই মহান ব্যক্তিত্ব বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দূত হয়ে ওঠেন।

রাদিচের মা বেটি রাদিচেও ছিলেন ধ্রুপদি ল্যাটিন সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট অনুবাদক ও সম্পাদক। রাদিচে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে অক্সফোর্ডে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ার সময় কেন বাংলা ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, সেটা কারো কাছে পরিষ্কার নয়। রাদিচে নিজেও এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা দিয়ে যাননি। কারও কারও ধারণা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে আলোড়নেই হয়তো বাংলার প্রতি আগ্রহ বাড়ে তাঁর। তবে এর কিছু দিনের মধ্যে সোয়্যাস-এ বাংলা ভাষার ছাত্র হিসেবে উইলিয়ামের মতো মেধাবী এক জনকে দেখে শিক্ষকেরা চমৎকৃতই হয়েছিলেন।

সেখানে অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন উইলিয়াম। 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেন উইলিয়াম। তর্জমাও করেন 'দ্য পোয়েম অব দ্য কিলিং অব মেঘনাদ'। উইলিয়ামের ভাষান্তরে 'দেবতার গ্রাস' (স্ন্যাচড বাই দ্য গডস)-এর অপেরাধর্মী উপস্থাপনা করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সুরকার পরম বীর।

'জীবিত ও মৃত', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা'র ভাষান্তর ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা', 'লিখন', 'স্ফুলিঙ্গ'-এর অণুকবিতাগুলো নিয়ে উইলিয়ামের সৃষ্টি 'পার্টিকলস, জটিংস, স্পার্কস'। 'টুনটুনির বই' তাঁর হাতে হয়ে ওঠে 'দ্য স্টুপিড টাইগার অ্যান্ড আদার টেলস'। তাঁর নিজের ইংরেজিতে লেখা কবিতা সম্ভারও রয়েছে।

এক দশক আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ায় রাদিচে তাঁর লেখালেখির 'ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ইতালি থেকে। গবেষণা সূত্রে কলকাতা ও বিশ্বভারতীর সারস্বত সমাজে মান্য হয়ে ওঠেন রাদিচে। বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চালিয়ে গেছেন আজীবন। ২০১২ সালে কলকাতায় ইংরেজিতে 'রাজা' নাটকে রাজার ভূমিকায় অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। তাঁর অকালপ্রয়াণে বিশ্বে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হল।

বাংলা ভাষার ধ্রুপদী ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রসঙ্গে কিছু কথা

নীতিশ বিশ্বাস

----

(২)

তবে ধ্রুপদি ভাষার সেই গুরুত্ব শিক্ষাঙ্গনের পঠন-পাঠনে বর্তমানে আর নেই। কারণ গত ২১শে জুলাই ২০২৩ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো। নয়া শিক্ষানীতি ২০২০'র মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পেছনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ,উক্ত শিক্ষাদর্শ -থেকে ১৮০ডিগ্রী ঘুরে গেলো। মোদী-সরকার নির্বাচনের পরাজয়ের আশংকায় ভাষানীতির ক্ষেত্রে আপাত প্রতিশ্রুতির বান ডেকে দিলেন। তাদের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (ঙ্খঙ্ক(ঙ্ক) একেবারে সরকারী আদেশনামা বা সার্কুলার (CBSE/ DIRSACAD)/২০২৩ Jully ২১, ২০২৩ Circu No Acad-৮৪/২০২৩) জারি করে বলে দিলো ; 'এখন থেকে ভারতের ২২টি জাতীয় ভাষামাধ্যমে তারা মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষা দেবেন।' শুধু তাই নয় সি-বি-এস-ই-র ডাইরেকটর ড. যোশেফ ইমানুয়েল জানিয়েছেন যে তাদের অনুমোদিত সমস্ত স্কুলে শিক্ষাদান করা হবে ভারতের প্রধান ২২টি ভাষার মাধ্যমে। যেখানে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয় সহ সব রাজ্যে তাদের অনুমোদিত যে সব বিদ্যালয় আছে তার সর্বক্ষেত্রে। এন সি ই আর টি এই সব ভাষায় সমস্ত পাঠ্য বইও প্রকাশ করবে।

স্বাধীনতার প্রায় ৮ দশক পরে এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। যারা আমরা ভারতে ভাষা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করি তারা একক ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সব জাতীয় ভাষা তথা সংবিধানের অষ্টম শিডিউলের ২২টি ভাষা ও সেই ভাষা মাধ্যমে যথাস্থানে শিক্ষাদানের দাবি করে আসছিলাম দীর্ঘ দিন ধরে। নানা অজুহাতে কর্তৃপক্ষ তা অমান্য করে আসছিল। এমন কি আন্দামান ও ঝাড়খন্ডের মতো যেসব রাজ্যের বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ে এন সি ই আর টি-র বাংলা বই নেই বলে তাদের হিন্দিবই প'ড়ে বাংলায় উত্তর দিতে হোত। সেই অভাগা ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অপুষ্ট শিক্ষা জীবন শেষ করতে বাধ্য হচ্ছিল।

জনসংখ্যার দিকথেকে ভারতে ২য় প্রধান মাতৃভাষা বাংলা (পৃথিবীর ৪র্থ ভাষা) ভাষার বইও এন সি ই আর টি (NCERT) ছাপেনি। ফলে পূর্বোক্ত ধ্রুপদি ভাষা ছাড়া উচ্চ শিক্ষায় পড়ানো হবেনা বলে যে ফরমান শিক্ষানীতিতে ছিলো তা আপাতভাবে নিস্ক্রিয় হয়ে গেলো। তাই ধ্রুপদি ভাষার নামে যে মধ্য শিক্ষাঙ্গনের ঢোকার চাবি ছিলো , সে ২০২৪ এসে তার মর্যাদা হারালো ।

আজ মনে হয় বাংলার ভারতে সর্ব প্রথম ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিলো। কারণ প্রাচীনত্বের বাধা এড়াতে পারলে বাংলা ভাষার আরো যে সব বৈশিষ্ট্য আছে তা হল ঃ

১) এশিয়ার প্রথম নোবেল এসেছে এই ভাষায়, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের ভাষা বাংলা ।

২) বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা ।

৩) বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত বাংলায় রচিত।

৪) বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম ভাষা

৫) এই ভাষায় নির্মিত সিনেমার জন্য বাঙালির গৌরব সত্যজিতের হাত ধরে অস্কার লাভ করেছে ভারত।

৬)ভারতের সবচেয়ে বেশি অনুদিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য রাজী।, দেশভাগ নাহলে জনসংখ্যা (ভারতে ৮.৪ %) ও পৃথিবীর ৪র্থ জনসংখ্যার (৩৮কোটি) ও সাহিত্য গৌরবে বাংলাই হত ভারতের রাষ্ট্রভাষা ।

সে যাই হোক বাংলা ভাষাকে যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার হাতে ভাতে মারার চক্রান্ত করছিল এই ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি সেই অবিচারের সাগর থেকে এক ঘটি জল তুলে দেওয়া হল । কিন্তু আমরা ঘরের মানুষদের সচেতন করতে চাই , কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে যদি এই সরকারের হিন্দুত্ববাদী ভ্রান্তশিক্ষা নীতি সমর্থন করে এবং নিজের রাজ্যকে ,রাজ্য ভাষাকে দুর্বল করার পথে পা বাড়ায় তাহলে এ সব রাংতার মুকুটে ভাষা জননীর অন্ন সংস্থান হবেনা, । তার প্রমাণ এবছই যে আট হাজার বাংলা স্কুল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রের ভাগ্য শেষকরে দেবার প্রক্রিয়ায় ৭০/৮০ হাজার শূন্য পদ রেখে খেলা মেলা আর দুর্নীতিতে রবীন্দ্র নজরুল বিবেকানন্দ সুভাষের বিপ্লবী বাংলাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেহবে বাঙালির চরম দুর্ভাগ্য,। আমরা তার থেকে মুক্তি চাই । ধ্রুপদি ভাষার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে এই

বেদনার অশ্রুপাতও করলাম মাতৃভাষা প্রেমে ।

তবে পূর্বেই বলেছি কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি মতো এখনও ধ্রুপদি ভাষার জন্য কিছু সুবিধা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভারত সরকার ২০০৪ সালের ১লা নভেম্বর, জানান যে-

১) বার্ষিক দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার।

২) একটি উচ্চ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন,

৩) ইউ জি সি অনুমোদনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদি ভাষা গবেষণার কয়েকটি চেয়ার সৃজন, ইত্যাদি। যার কথা সে সময়ে এক ঘোষণায় আরো জানানো হয়, কি কি সুবিধা পাবে ধ্রুপদি ভাষা ?

১) as per Government of India's Resolution No.2-16/2004-US (Akademies) dated 1st November– 2004 The benefits that will accrue to a language declared as "Classical language" are ১.Two major international awards for scholars of eminence in Classical Indian Languages are awarded annually.

২) A 'Centre of Excellence for Studies in Classical Languages is setup

৩) The University Grants Commission be requested to create– to with at least in the Central Universities– a certain number of Professional Chairs for Classical Languages for scholars of eminence in Classical Indian Languages.)

ধ্রুপদি ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঐ আদেশ নামায় জানানো হয়েছিল ঃ In a press release– Minister of Tourism & Culture Ambika Soni told the Rajya Sabha the following criteria were laid down to determine the eligibility of languages to be considered for classification as a "Classical Language" (২০০৬),

High antiquity of its early texts/recorded history over a period of 1500-2000 years a body of ancient literature/texts–which is considered a valuable heritage by generations of speakers–the literary tradition be original and not borrowed from another speech community–the classical language and literature being distinct from modern– there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms or its off shoots.

The Indian Government has been criticized for not including Pali as a classical language– as experts have argued it fits all of the above criteria.

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে সর্ব ভারতীয় বাংলা ভাষামঞ্চের আন্দোলনের ১৭ দফা দাবিপত্র ,২০১৪ এর মূল কয়েকটি দাবিছিলো ঃ

ক) পশ্চিবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সমীপে-

১। ক) স্বশাসিত জেলাবাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ধরণের বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১ম বা ২য় ভাষা হিসেবে বাংলা রাখতেই হবে। যা ভারতের অন্য সমস্ত রাজ্যে আগেই কার্যকর ছিলো, কেরল সহ অন্য রাজ্যে বর্তমানে তা আরো কঠোর করা হয়েছে। খ) তবে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্র কমে যাবার অছিলায় সরকার পোষিত বাংলা স্কুলগুলিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে। আজ পর্যন্ত ৮৫০০ বাংলা স্কুল বন্ধ করা হয়েছে।

২। ক) রাজ্যের সমস্ত সরকারি কাজ, মুখ্যত রাজ্যের মুখ্যভাষা বাংলায় করতে হবে। খ) পি এইচ ডি সহ উচ্চশিক্ষার সর্বক্ষেত্রে বাংলাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩। ক) বাংলাকে কাজের ভাষা করে তুলতে হবে, সে ব্যাংক, আদালত, রেল, সরকারি-বেসরকারি সমস্ত দপ্তরের সংযোগের ভাষা হিসেবে বাংলাকে মর্যাদা দিতে হবে। খ) সমস্ত সাইন বোর্ড, পথ-লেখা, ঘোষণা সহ জন-বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা রাখতেই হবে।

(ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপিত)

১। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সহ কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত সমস্ত স্কুলে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনসংখ্যার ভাষা, বাংলাভাষা পড়ানোর ও বাংলাভাষায় পড়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোসহ ব্যবস্থা করতে হবে। NCERT-র পাঠ্য বই বাংলায়ও প্রকাশ করতে হবে। এ দাবি কেন্দ্র মেনেছে।

২। গ) কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারতের দ্বিতীয় প্রধান জনসংখ্যার ভাষা বাংলার জন্য দেশের দ্বিতীয়-প্রধান বাজেট-বরাদ্দ রাখতে হবে। ঘ) বাজেট চাই সাঁওতালি ও পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাগুলির জন্যও।

৩। ঝাড়খণ্ড ও আন্দামান সহ যেসব রাজ্যে বাংলাভাষীরা বাস্তব-জনসংখ্যার বিচারে প্রথম / ২য় স্থানে আছে, সেসব রাজ্যে বাংলাকেও প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সেখানে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় একটি পূর্ণ-পত্র বাংলা রাখতে হবে ও বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার সযোগ দিতে হবে

৪। ক) দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলির সঙ্গে ওড়িয়া ভাষাও 'ধ্রুপদি-ভাষার' স্বীকৃতি পেয়েছে,তার সঙ্গে বাংলাকেও 'ধ্রুপদি-ভাষার' স্বীকৃতি দিতে হবে। খ) ঐতিহ্যবান আদিবাসী ভাষা সাঁওতালি ও ধর্মের ভাষা পালিকেও ধ্রুপদিভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে।

৫। আই-এ-এস ও রেলের চাকুরির পরীক্ষা যখন বাংলায় দেওয়া যায়, তখন আই.এ.এস. প্রিলিসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পরীক্ষা বাংলায় দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ও প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষাকেও যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে।

৬। সরকারি টি-ভির জাতীয় চ্যানেলে বাংলা অনুষ্ঠান চালু করতে হবে। রাজ্যের চ্যানেলে বাংলা অনুষ্ঠানের জন্য সময় আরো বাড়াতে হবে। বাংলা চ্যানেলে হিন্দি গান ইত্যাদি ঢোকানো যাবে না।

৭। পার্লামেন্টে বাংলায় ভাষণ দেবার অধিকার সঠিক ভাবে রাখতে হবে।

৯। ক) দিল্লি, আন্দামান, ঝাড়খন্ড সহ বাঙালি অধ্যুষিত স্কুলে NCERT-র বই বাংলায়ও দিতে হবে। খ) সেখানের শহরের সাইন বোর্ড সহ পথ- লেখায় অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলাও রাখতে হবে। গ) শিলচর স্টেশনের নাম ভাষা শহিদ স্মারক স্টেশন অবিলম্বে করতে হবে।

১০। দূরসঞ্চার শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে (ইগনু, নেতাজি মুক্ত, রবীন্দ্র মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয়সহ) পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা প্রতিষ্ঠানের বাংলামাধ্যমের কোর্সগুলি অন্য রাজ্যেও চালু করার অনুমতি কেন্দ্রকে দিতে হবে।

১১। রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর রচনাবলী ভারতীয় সমস্ত ভাষায় অনুবাদ, প্রকাশ ও গান্ধি-রচনাবলীর মতো স্বল্প মূল্যে বিতরণ করতে হবে, যা সমৃদ্ধ করবে জাতীয় সংহতি-কে।

১২। বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষে তার শেষ কর্মস্থানে তার নামে দূরশিক্ষাসহ বিদ্যাসাগর আন্তর্জাতিক বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। যার মাধ্যমে ভারত সহ সারা পৃথিবীর বাংলা শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ পাবেন।

উপসংহার ঃ আগে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতির বিষয়ে সাধারণ ভাবে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা গোত্রের ভাষা সমূহের তেমন আগ্রহ ছিলো না। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ঠ্য হল ক্ষমতা দখলে গণ ভোট । আর তার জন্য সব সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক , সেই সূত্রে গোবলয়ের হিন্দি প্রধান্যের বিরুদ্ধে যাতে আন্দোলন গগনস্পর্শী না হতে পারে তাই ২০০৪ সালে পূর্বোক্ত নিয়ম চালু হয়। তাতেও তেমন কিছু ছিলো না কিন্ত ২০১৪ সালে ওড়িয়ার স্বীকৃতি ও ২০২০-র নয়া শিক্ষানীতির চক্রান্ত সচেতন না হলে আমাদেরও এ আন্দোলনে নামতে হোত না। যা উপরে সংক্ষেপে আলোচিত হল। এবার চাই এর সঙ্গে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ও রম্য ভাষণ যেনো অনৃত- ভাষণে পরিণত না হয়, তার প্রতি আমাদের সজাগ দৃষ্টিপাত।

(শেষ)

লেখক নীতিশ বিশ্বাস , বিশিষ্ট সমাজ ভাষা গবেষক এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদক, বাংলা ভাষা মঞ্চ ও ঐকতান গবেষণা পত্র।

বাংলাদেশ : হেমন্তের কান্না

মনিরুল হক

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ, আমরা তো এক দেশই ছিলাম। দুস্তর ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি বৃহত্তর ভারতের রাজনীতি, ভারত ভাগ, পাকিস্তান ভাগ এবং বাংলাদেশের সৃষ্টি। তারপর দেখছি পঞ্চাশ বছর ধরে পথ চলা এক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। বারবার নতুন নতুন সীমারেখা গজিয়ে উঠলেও কোথাও রয়ে গেছে আন্তরিকতার এক টান, সহমর্মীতার এক আবরণ। সৃষ্টির পর থেকে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু বিপর্যয় কাটিয়ে আবারও উঠে দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে।

রাজনীতিবিদদের হাতে থাকাই উচিত এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সামাজিক ন্যায়, সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ, সব মানুষের সমান অধিকার, মানুষকে বর্ণ-ধর্ম-জাত-শ্রেণীতে বিভক্ত না করার নীতির উপর ভিত্তি করে। বিশেষ ধর্মীয় আদর্শ, আইন-কানুন এবং রীতিনীতি বর্জন করাই আধুনিক, প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যে সব দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করেছিল তার মধ্যে এই উপ-মহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান, এই দুটি দেশ দুই পথে যাত্রা শুরু করে। ভারত গনতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে দেশ গঠনের মূল স্তম্ভ হিসাবে গ্রহণ করে। সেই মতন সংবিধান প্রণীত হয়।বিপরীতে পাকিস্তান একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করে , যার ভিত্তি ছিল সামরিক শাসন।গণতন্ত্র ছিল প্রহসন। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার বাংলাভাষী মানুষের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল কারণ ছিল, পাকিস্তান দেশটি বারবার নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে।প্রথমবার তাঁরা ১৯৫৪ সালের নির্বাচিত সরকারকে খারিজ করে। এরপর অনেক সংগ্রামের পথ পেরিয়ে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ থেকে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করে। পশ্চিমপারের হাতে পূর্বপারের শোষন এবং তাদের প্রতি অগনতান্ত্রিক শাসন। এই শাসন-শোষনের বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছিল পূর্বপার। ধর্ম মূলত এক হলেও পূর্বপারের মানুষ মরণপণ সংগ্রাম চালিয়েছে পশ্চিমপারের বিরুদ্ধে। ধর্ম এক্ষেত্রে রাজনীতিকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। তবে মনে রাখা দরকার; অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, রাজস্বের নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক বাটোয়ারা, বঞ্চনা, অসাম্য এবং জোর করে উর্দু চাপানোর বিরুদ্ধে জন আন্দোলনে শেখ মুজিব যতোই অবিসংবাদী নেতা হোন না কেন, একাত্তরে পাকিস্তানের পরাজয়কে ইসলামের পরাজয় হিসেবে দেখেছিল বাংলাদেশের এক বড় অংশের মানুষ। এর পর নবীন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' নির্মাণের ভিত্তি হিসাবে ইসলামিক জিগিরকেও প্রশ্রয় দেননি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। যে কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীতও সে দেশের মানুষের গভীর আবেগ বহন করে। 'আমার সোনার বাংলা' -র মতো জাতীয় সঙ্গীতেও কোনও পাকিস্তানি বা ইসলামী অনুসঙ্গ নেই।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল বর্তমান বাংলাদেশের এক বড় অংশের মানুষ। জামাত-ই-ইসলামি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি সংগঠনের পাকিস্তান প্রীতি আসলে ছিল ইসলাম-সঞ্জাত। তথাকথিত ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই 'ইসলামিক বীর'দের ওই সব সংগঠন সরাসরি যুদ্ধে নেমেছিল মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশ মুক্ত হবার এক বছর পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক শক্তি তিন বছর পর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করে মৌলবাদী সামরিক শাসকরা। তারা ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম বলে ঘোষণা করে।কিন্তু দীর্ঘ গণ আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়। এইবার মার্কিন মদতপুষ্ট সেই একই ধর্মান্ধ শক্তি তথাকথিত ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবারও কৌশলী ও সহিংস খেলায় মেতে উঠেছে।

প্রায় স্বঘোষিত 'উপদেষ্টা সরকার' গঠনের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সরকার জনমানসে কোন সদর্থক ছাপ ফেলতে পারে নি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে নৈরাজ্য। জিনিষপত্রের দাম ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। উপদেষ্টাদের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। সরকার প্রয়োজনীয় কাজ শিকেয় তুলে আত্মমগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে। অনেকেই বলছেন জুলাই-অভ্যুত্থানের নেতাদের জনপ্রিয়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। সর্বস্তরের মানুষ বিরক্ত কিন্তু দিশাহারা।

কিন্তু আমাদের মত হল, উপদেষ্টা-সরকার দিশাহারা নয় বরং নিজেদের ক্ষমতাকে আরও সংহত করার চেষ্টা করছে। তারা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের আশু লক্ষ্য আওয়ামী লিগের নেতা-সদস্য-সমর্থক-সহমর্মীদের ধনে-মানে-জানে শেষ করে দেওয়া, আর বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে দেশটিতে তথাকথিত 'প্রকৃত ইসলাম' কায়েম করা।

অন্যদিকে বহুদিন ধরেই আমেরিকা চাইছিল দেশের জনপ্রিয় দুটি দল আওয়ামী লিগ ও বি এন পি-কে বাদ দিয়ে নতুন কোনও শক্তিকে তুলে ধরা যাদের তেমন কোনও জনভিত্তি নেই। কারণ জনভিত্তি না থাকলে সেই সরকার হবে অনেক বেশি নড়বড়ে এবং তখন তাদের উপর ছড়ি ঘোরানো অনেক সহজ হবে। বাংলাদেশের এই জনভিত্তিহীন উপদেষ্টা সরকারও তাই আমেরিকার বড্ড পছন্দের।

এর আগে আমরা আমাদের দেশে দেখেছি কিভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদের দর্শন বিজেপি দলের দর্শন হয়ে উঠেছে। তারা উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসারকেই তাদের দলের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। কখনও কখনও সাফল্য পেলেও ভারতের হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই উগ্র হিন্দুত্ববাদকে এখনও গ্রহণ করে নি। কিন্তু বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীরা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে এবং এখন তা ধরে রাখার জন্য নানান ফন্দি-ফিকির করে যাচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন ইসলামের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েও মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার এবং যুক্তি-তর্কের পরিসর রচনা করা সম্ভব হতো। আমরা জানি প্রশ্ন, সন্দেহ, সংশয় মানুষের মনে আগ্রহ ও কৌতুহল বাড়িয়ে তোলে এবং সে সব নিরসনের প্রচেষ্টাই মানুষকে নতুন পথ ও নতুন আবিস্কারের সন্ধান দেয়। একদিকে ইসলামের জয়যাত্রা এবং অপরদিকে ভারতীয় জ্ঞান ও গ্রীক যুক্তিবাদ ছিল সেই সময়ের ইসলামিক চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের প্রেরণার উৎসস্থল। কিন্দি, ইবন রুশদ, শিনা, ফারাবির মতো জ্ঞানী গুনী মানুষেরা এক সম্মিলিত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চেতনার ফসল। এই যুগকেই ইসলামের স্বর্ণযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক এর পরেই ইসলামিক দুনিয়ায় দার্শনিক ইমাম গজ্জালির আবির্ভাব হয়। ইমাম গজ্জালির মতবাদ হল ধর্ম যুক্তি বা প্রশ্ন মানে না, তার আস্থা আনুগত্য ও বিশ্বাসের উপর। বলা বাহুল্য এই মতবাদ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং এর পর থেকেই ইসলামী দুনিয়ায় মুক্ত চিন্তার পরিসর সংকুচিত হতে হতে তা শূণ্য অঙ্কে পৌঁছায়।

তাই এ কথা পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া যায় যে কোন ধর্মীয় দর্শন বা শক্তিই রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ামক হয়ে উঠতে চাইলে তা দেশের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক অশনি সংকেত। এই সংকেত ভারতের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, বাংলাদেশের পক্ষেও তেমন সত্য। বাংলাদেশের উগ্র ইসলামিক শক্তি ক্ষমতা দখলের পরপরই অত্যন্ত সুচতুর ভাবে তাদের ধর্মীয় অ্যাজেন্ডা কার্যকর করে যাচ্ছেন। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সেই ইঙ্গিতই বহন করে। তবে তাতে দেশের মানুষের কি লাভ, কতটাই বা ক্ষতি সে হিসাব তারা করবেন না। তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশে আরবীয় খলিফাযুগের মতো শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। বাংলাদেশের মাটি যেন আরবের মতো, সেখানে ফুটিয়ে তুলতে হবে স্বপ্নের মরুগোলাপ! অন্য সব কথা বাদ দিলাম, কেন খলিফারাও শান্তিতে বেঁচেবর্তে থেকে দেশ শাসন করতে পারেন নি, কেনইবা খলিফাতন্ত্রের পতন হল সে কথা তাঁরা ভাববেন না? তাঁরা না ভাবতে পারেন, আমি-আপনিও কি ভাবব না? বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারায় পরিবর্তন এসেছে। আজ আর ১৫০০ বছর পূর্বের খলিফাতন্ত্রে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়; বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা, যুক্তির অবতারনা, প্রগতিশীলতার প্রসারের সাথে সাথে ব্যক্তির উপর ধর্মের প্রভাবও কমে আসছে। তাই বর্তমান সময়ের দাবি উদার গনতন্ত্র। সুতারাং কোন ধর্মের (সে ইসলাম ধর্ম হলেও) আইন-কানুন অনুযায়ী দেশ শাসন করা আজ আর সম্ভব নয়। ইতিহাসের চাকা সব সময় সামনের দিকেই ঘুরবে।

মনে পড়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটো লাইন-

''মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ...
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলীম পারে''

কিন্তু এখন উল্টোপুরাণ।

সুধাশ্যামলীম বাংলাদেশের মাটিতে মরু-সংস্কৃতির আমদানির যে আকাঙ্খা আমরা গত কয়েকমাস ধরে দেখছি তা ফলবতী হওয়ার দূরবর্তী কোন সম্ভাবনাও আমাদের চোখে পড়ছে না, কিন্তু সে আকাঙ্খা যে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখনই হেমন্তের কান্নায় পরিণত হয়েছে তা বলার জন্য কোন পান্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।